বাংলা ও ইংরেজিতে
এরাজ্যের নাম
থাক
পশ্চিমবঙ্গ
পৃঃ - ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

'ভারত ছাড়ো'
আন্দোলনের
৭৫ বছর
পৃঃ - ২৯

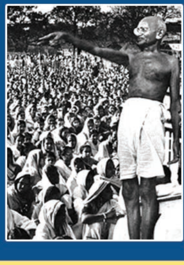

৬৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬।। ১৯ ভাদ্র - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

শিক্ষক দিবসের শ্রদ্ধার্ঘ্য
ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৯ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৫ সেপ্টেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বন্ধুহীন অবস্থার জন্য দায়ী বিগত মনমোহন সিংয়ের ইউ পি এ সরকার □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : মানস সরোবরে হাবুডুবু অধীর □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

বাংলা ও ইংরেজিতে এরাজ্যের নাম থাক পশ্চিমবঙ্গ □ ধীরেন দেবনাথ □ ১২

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 'শিক্ষার এই ঘোর আঁধারে তোমারে খুঁজি হে ধ্রুবতারা' □ ড. তুষারকান্তি ঘোষ □ ১৪

কৃষক-দেবতা বলরাম □ অজিত বারিক □ ২১

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম □ অমিত ঘোষদস্তিদার □ ২৩

কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির সমন্বয় □ এম জি বৈদ্য □ ২৭

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ৭৫ বছর □ আশিস রায় □ ২৯

শুধু নারীশক্তির নয়, প্রয়োজন ঐশ্বর্যময়ী শক্তির জাগরণ □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এবার কি পূর্ব-পাকিস্তানের পথে বালুচিস্তান ?

কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান যখন ভারতের বিরুদ্ধে নিরন্তর অভিযোগ করে চলেছে, তখন তাদেরই এক অঙ্গরাজ্য বালুচিস্তান দীর্ঘদিন ধরে পাক-সেনাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পাক-সেনাদের বর্বরতা সীমা ছাড়ালেও তারা দমেনি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই নিয়েই এবারে স্বস্তিকা-র প্রচ্ছদ নিবন্ধ— বালুচিস্তানের পাশে ভারত। লিখেছেন প্রণয় রায়, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে অশান্তি ও মেহবুবা সরকার

গত প্রায় দুই মাস ধরিয়া কাশ্মীর অশান্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও মূল বিষয় হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে কাশ্মীরের অশান্ত পরিস্থিতি। জিএসটি বিলের মতো কাশ্মীর ইস্যুতেও দেশের সকল রাজনৈতিক দলের এক সুরে কথা বলিবার জন্য বিশ্ব দরবারে, বিশেষত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে ভারতের ঐক্যবদ্ধ রূপটি আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশ বিভাগের সময় হইতে আজ পর্যন্ত কাশ্মীর যে বারবার অশান্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার কয়েকটি দিক রহিয়াছে। এই সকল বিষয়গুলির সম্যক পর্যালোচনা জরুরি। প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, ইসলামিক ধ্যানধারণা। বুরহান ওয়ানি নিহত হওয়ার ফলে উপত্যকা যে উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রধান কারণই হইল ইসলামিক মতবাদের প্রাধান্য। হুরিয়ত কনফারেন্স ও জমিয়ত-এ-উলেমার প্রভাবের কথা স্বীকার করিয়াও বলা যায়, যে সকল যুবক নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুড়িতেছে, ইহা সাম্প্রতিক ইসলামি দুনিয়াতে যে বিক্ষোভ চলিতেছে তাহারই প্রভাব। ইহার মোকাবিলার জন্য সংসদে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা 'কাশ্মীরিয়ত' জাগ্রত করিবার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। তাহাদের কাছে 'কাশ্মীরিয়ত' সুফি সংস্কৃতির মতো উদারতারই সূচক। কিন্তু বাস্তব হইল, যে ইসলামিক মতবাদের বশবর্তী হইয়া একদা উপত্যকা হইতে হিন্দুদের উৎখাত করা হইয়াছিল, আজ তাহাই নূতন রূপে প্রকাশিত। এই তথ্যকে অস্বীকার করিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর যে বারবার গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে তথাকথিত উদারবাদীরা খুশি হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবে কাশ্মীর আন্দোলন হইতে অন্যদিকে চোখ ঘুরাইয়া দিবার ইহা একটি পরিকল্পিত প্রয়াস।

কাশ্মীরে অশান্তির খলনায়ক যে পাকিস্তান তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। পাকিস্তান বিশ্বাস করে কাশ্মীর উপত্যকা এমন একটি অঞ্চল যেখানে নাগরিক অশান্তি এবং আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করিয়া ভারত হইতে তাহা বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। বুরহান ওয়ানির মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া কাশ্মীরে যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে পাকিস্তান ইহাতে হাজার গুণ উৎসাহিত হইয়া ভারতকে সব দিক হইতে আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জম্মু-কাশ্মীরে এখন যে পিডিপি-বিজেপি জোট সরকার চলিতেছে, এই দেশের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে তাহা চক্ষুশূল। এই জোট সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখিতে কিংবা ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। একথা ঠিক যে পিডিপি এখন চাপের মধ্যে রহিয়াছে, কেননা অশান্তির কেন্দ্র তাহাদেরই প্রভাবিত এলাকা। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি কাশ্মীরে শান্তি ফিরাইতে সব পক্ষের সঙ্গে (পড়ুন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে) কথা বলিতে ইচ্ছুক। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রদর্শিত ইনসানিয়ত (মানবিকতা), জমহুরিয়ত (গণতন্ত্র) এবং কাশ্মীরিয়ত (উদারতা)—এই তিনটি বিষয়কে সামনে রাখিয়াই তিনি অশান্তির আগুন নিভাইতে চাহেন।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। নব্বইয়ের দশকে কাশ্মীরে যে অশান্তি দেখা দিয়াছিল, তাহাতে আন্তর্জাতিক মহলে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। এইবার কিন্তু কাশ্মীরের অশান্তি লইয়া কেহ কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নাই। নব্বইয়ের দশকে কাশ্মীর ইস্যুটির যেরূপ আন্তর্জাতিকীকরণ হইয়াছিল, এইবার তাহা হইয়া উঠিতে পারে নাই। বরং ইহা আই এস আই এস-এর মতো সংকট সৃষ্টি করিতে পারে যাহা ভবিষ্যতে পাকিস্তানকে অস্থির করিয়া তুলিবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক মহলের উদাসীনতায় মানবাধিকার এজেন্সিগুলি এবং একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের গায়ে যে জ্বালা ধরিয়াছে তাহা স্পষ্ট। ইহারা তাই নানাভাবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের মুণ্ডপাত করিতে ব্যস্ত। কাশ্মীরের বর্তমান অশান্ত পরিবেশের মোকাবিলায় 'একতা ও মমতা' বোধ গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে কোনোরকম আপস করা হইবে না।

সুভাষিতম্

যস্য ন বিপদি বিষাদঃ সম্পদি হর্ষো রণে ন ভীরুত্বম্।

ত্বং ভুবনত্রয়তিলকং জনয়তি জননী সুতং বিরলম্।। (হিতোপদেশ)

বিপদেও প্রফুল্ল, সম্পদে উল্লাসহীন, রণভুমিতে কাপুরুষতা দেখায় না, ত্রিলোকে এরকম লোকই ধন্য। এরকম জন্মদাত্রী মায়ের সংখ্যাও বিরল।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ফতোয়ায় আতঙ্কিত হিন্দুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের হিন্দুদের সঙ্গে কাশ্মীরের হিন্দুদের আদৌ তফাত আছে কি? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর, নেই। সম্প্রতি সর্বদলীয় অভিবাসী সমন্বয় কমিটির (এপিএমসিসি) চেয়ারম্যান বিনোদ পণ্ডিত এই নিয়ে তাঁর উদ্বেগ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন উপত্যকা থেকে তাড়াবার জন্য কাশ্মীরি হিন্দুদের লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর পিছনে পাকিস্তানের মদত রয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। এর আগে, ১৯৯০ সালের গণ-অভিবাসনের পর কিছু কাশ্মীরি হিন্দু পরিবার কাশ্মীরে রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হিজবুল মুজাহিদিন নেতা সন্ত্রাসবাদী বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর কাশ্মীরে যে নৈরাজ্যবাদী বিক্ষোভ চলছে তার আড়ালে সুন্নি-ওয়াহাবি মৌলবাদীদের আসল উদ্দেশ্য হলো কাশ্মীরকে হিন্দুমুক্ত করা। উত্তর এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য পোস্টার পড়েছে যার বক্তব্য, কাশ্মীরি হিন্দুদের অবিলম্বে কাশ্মীর ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় মৃত্যু অনিবার্য।

দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সরকারি আবাসনের আশেপাশে পোস্টারের সংখ্যা সব থেকে বেশি। হুমকির মূল লক্ষ্য কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা। সব পোস্টারেই ব্যবহার করা হয়েছে লস্কর-ই- ইসলামের (ইসলামের সৈন্য) লেটারহেড। মজার ব্যাপার হলো, বুরহান ওয়ানির সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের সঙ্গে লস্কর-ই-ইসলামের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। কিন্তু হুমকি-পোস্টারে সেই তিক্ততার আঁচ লাগেনি। শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দেওয়া কথাগুলো জ্বলজ্বল করছে, 'সমস্ত বাইরের লোক আর আর এস এস কাশ্মীর ছাড়ো/ নয়তো মরো।' কিংবা, 'মুসলমানদের খুন করার জন্য কাশ্মীরকে যারা ইজরায়েল বানাতে চায় সেই কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কোনো জায়গা এখানে নেই।'

বিনোদ পণ্ডিতের অভিযোগ, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ খুবই হালকা ভাবে নিচ্ছে। পুলিশের বক্তব্য দক্ষিণ কাশ্মীরে লস্কর-ই-ইসলামের কোনো অস্তিত্ব নেই। সেই কারণেই হুমকি-পোস্টার সেঁটে তারা নজরে আসতে চাইছে।

পুলিশ যাই বলুক, ২০১৫ সালের মে মাসে সোপুর অঞ্চলের কয়েকজন টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ারের মালিককে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে লস্কর-ই-ইসলাম প্রথম খবরের শিরোনামে উঠে আসে। হুমকি পাওয়ার পর খুনও হন কয়েকজন। তখন মনে করা হয়েছিল লস্কর-ই- ইসলাম হিজবুলেরই শাখা সংগঠন। পরে দু'পক্ষই তা অস্বীকার করে।

এদিকে, গত বছর প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজ ঘোষণার পর অনেক কাশ্মীরি পণ্ডিত কাশ্মীরে ফিরে এসেছিলেন। ফতোয়া জারি হবার পর এখন তাঁরা আবার জম্মুতে কিংবা জম্মু-কাশ্মীরের বাইরে দেশের অন্যত্র কোথাও চলে যেতে চাইছেন। অনেকে চলেও গেছেন। তারা ১৯৯০-র সেই ভয়াবহ দিনগুলি ভোলেননি, যখন মসজিদ থেকে ফতোয়া দিয়ে বলা হয়েছিল, 'কাশ্মীরি পণ্ডিতরা হয় এখান থেকে চলে যাও, নয়তো মুসলমান হয়ে যাও। তা না হলে মরো।' আতঙ্কিত দিশেহারা কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা ভিটেমাটি ত্যাগ করে সপরিবারে জম্মুতে চলে যান। কিংবা অন্য কোথাও। সরকারি তথ্য অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদীরা বেছে বেছে শুধু কাশ্মীরি পণ্ডিতদেরই হত্যা করেছিল এবং সাড়ে ৩ লক্ষ মানুষ কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেন। কিন্তু এখন কাশ্মীরে হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা কঠিন হয়ে উঠেছে। কয়েকশো পণ্ডিত পরিবার চলে গেছেন। তাদের একজন বলছেন, 'আমরা প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুলই করেছি। ওরা আমাদের এখানে থাকতে দেবে না।

শুধু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি সন্ত্রাসবাদীরা। সেইসঙ্গে তালিবানি কায়দায় সতর্ক করে দিয়েছে মেয়েদেরও। পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মেয়েরা স্কুটিতে চড়লে স্কুটিসহ আরোহিণীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে। কাশ্মীরের 'আজাদির' লড়াই যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ সমস্ত দোকান ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি সারাক্ষণ খোলা রাখার আদেশ দিয়েছে কয়েকটি সংগঠন। সব দেখেশুনে ভূস্বর্গকে নরকের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মোদীর সমালোচক ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক দল এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ এই বিষয়ে কী বলছেন? এতদিন বাহিনীকে তাক করে পাথর ছোঁড়াকে বলা হচ্ছিল আবেগ। নিরাপত্তা রক্ষীর মৃত্যু হলে সেই খবর চেপে দিয়ে দোষারোপ করা হচ্ছিল বাহিনীকে, 'সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করার জন্য!' এখন কি মনে হচ্ছে না বুরহান ওয়ানির মৃত্যুজনিত গণ-আবেগ (!) আসলে ধোঁকার টাটি। এর আড়ালে রয়েছে সমগ্র কাশ্মীরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র। যাতে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা আরেকবার ভিটেমাটি হারাতে বাধ্য হয়।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্রের ২০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং গিলগিট-বালটিস্তানের মানুষের অধিকার নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার মতামত ব্যক্ত করার পর এখনও একমাসও কাটেনি। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ওইসব অঞ্চলের যেসব মানুষ শরণার্থী হয়ে এসে ভারতে বসবাস করছেন তাদের জন্য ২০০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, প্যাকেজটি যাবতীয় খুঁটিনাটি-সহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের আকারে যত শীঘ্র সম্ভব ক্যাবিনেটের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

জম্মু-কাশ্মীর সরকার ইতিমধ্যেই ৩৬,৩৪৮টি শরণার্থী পরিবারকে চিহ্নিত করেছে এবং পরিবারপিছু ৫.৫ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেবার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বহু শরণার্থী দীর্ঘদিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে কাথুয়া এবং রাজৌরি জেলায় বসবাস করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এদের কারোরই ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর পাকিস্তানে তাঁদের ভিটেমাটি হারিয়ে ভারতে চলে আসেন। আবার কেউ কেউ এসেছেন ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধের পর। এই শরণার্থীরা ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার তাদের নেই।

স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি প্যাকেজ ঘোষণার খবরে এইসব প্রান্তবাসী মানুষেরা খুশি। যদিও জম্মু-কাশ্মীর শরণার্থী অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে সরকারি সাহায্য যাতে এই ২০০০ কোটিতেই শেষ হয়ে না যায় তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরের শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং উন্নয়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই মোট ৯,২০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। এই ২০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ মোট ব্যয়বরাদ্দের অংশবিশেষ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা শরণার্থীদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে এনডিএ সরকার ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসেই কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল প্যারামিলিটারি ফোর্স এবং রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের নানা স্তরে চাকরির সুযোগ। তবে তখনও এটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ একটি পরিকল্পনা। এ বছর ১২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সর্বদলীয় বৈঠকে প্রথম পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা শরণার্থীদের অধিকার নিয়ে সরব হন। এর তিন দিন পর, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মোদী আরও একবার গিলগিট-বালটিস্তান এবং বালুচিস্তানের মানুষের অসহায়তার কথা উল্লেখ করেন। আর ঠিক তখনই সাধারণ পরিকল্পনাটি সরকারের দায়বদ্ধতায় পর্যবসিত হয়।

কুরেশিকে হেফাজতে নেবে এন আই এ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইসলামের স্বঘোষিত প্রচারক জাকির নায়েকের ডান হাত এবং ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মী আরশি কুরেশিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এম আই এ)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারী ও শিশু-সহ ২১ জন নিখোঁজ ব্যক্তির অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেরল পুলিশ সন্দেহভাজন আরশি কুরেশিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের অভিযোগ ওই নিখোঁজ ব্যক্তিরা ইসলামিক স্টেটে যোগদান করেছে। এন আই এ সূত্রে জানা গেছে, জাকির নায়েকের সংস্থা ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে ভারতে ইসলামিক স্টেটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তারা বহু মানুষের ধর্মান্তরকরণ ঘটিয়ে এবং নানাভাবে প্ররোচিত করে ইসলামিক স্টেটে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। কুরেশিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে যে আরও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে তারা আশাবাদী। কুরেশির পাশাপাশি ২৯ বছর বয়েসি ইয়াসমিন আহমেদকেও নিজেদের হেফাজতে নিতে চলেছে এন আই এ। অভিযোগ, এই মহিলাও কেরল থেকে অজস্র অল্পবয়েসি ছেলেকে সিরিয়ায় পাঠিয়েছে আই এস-র হয়ে জিহাদে অংশ নেবার জন্য। সম্প্রতি কাবুলে তার স্বামীর কাছে পালানোর সময় সে ধরা পড়ে। পুলিশের অনুমান তার স্বামীও আই এস-র সঙ্গে যুক্ত এবং এখন কাবুলের বাসিন্দা।

আগামী তিনটি অলিম্পিকে ভালো ফলের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে টাস্ক ফোর্স গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রিও অলিম্পিকে ভারতের 'পারফরম্যান্স' ভালো হয়নি। আগামী ২০২০, ২০২৪ এবং ২০২৮ অলিম্পিকে রিও-র পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন। টাস্ক ফোর্সের কাজ হবে সুনির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করার মাধ্যমে অলিম্পিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের মান আরও উন্নত করা।

রিও-তে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে যে ক্রীড়ামন্ত্রকের রিপোর্ট তলব করা হবে এটা মোটামুটি সকলেই জানতেন। ক্রীড়ামন্ত্রকের এক আধিকারিকের দেওয়া সূত্র অনুযায়ী সেই রিপোর্ট সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি জমা দেওয়া হবে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণামতো টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে কয়েকদিনের মধ্যেই এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা, প্রশিক্ষণ এবং খেলোয়াড়দের নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারি নীতি প্রণয়ণের কাজও শুরু হবে যত শীঘ্র সম্ভব। স্বক্ষেত্রে সফল ক্রীড়াবিদ এবং ক্রীড়া প্রশাসকদের নিয়ে গঠিত হবে এই টাস্ক ফোর্স। পেশাদার বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবার রিও অলিম্পিকে ভারত ১১৯ জনের দল পাঠিয়েছিল। কিন্তু ব্যাডমিন্টনে পি ভি সিন্ধুর রুপো এবং ৫৮ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে সাক্ষী মালিকের ব্রোঞ্জ ছাড়া আর কোনো পদক আসেনি। এরা ছাড়া বলার মতো পারফরম্যান্স জিমনাস্টিক ভল্ট বিভাগের ফাইনালে দীপা কর্মকারের চতুর্থ স্থান লাভ।

এদিকে, ভারতের প্রতিটি ক্রীড়াসংস্থা এই মুহূর্তে রিও-র হতাশাজনক ফলের বিশ্লেষণে ব্যস্ত। ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোশিয়েশন অব ইন্ডিয়া (এন আই আর এ আই) অভিনব বিন্দ্রাকে চেয়ারম্যান করে একটি চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। রিও-র ব্যর্থতার নেপথ্যে প্রকৃত কারণগুলি খতিয়ে দেখবে কমিটি। প্রশাসক থেকে শুরু করে খেলোয়াড়— কারও কর্তব্যে গাফিলতি প্রমাণ হলে তাকে রেয়াত করা হবে না। অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আবার রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে টোকিও অলিম্পিকের জন্য তারা অল্পবয়সি কুস্তিগিরদের ওপর বেশি গুরুত্ব দেবে।

কুস্তি এবং শুটিং এমন দুটি ক্রীড়াক্ষেত্র সেখান থেকে ভারত পদক প্রত্যাশা করে। অথচ এবার শুটিং থেকে কোনো পদকই আসেনি। কুস্তিতে সবেধন নীলমণি একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন সাক্ষী মালিক। এটি ভারতের ভারতের খেলোয়াড়দের অবনতির পরিচয়। কারণ লন্ডন অলিম্পিকে কুস্তিতে সুশীলকুমার এবং যোগেশ্বর দত্ত যথাক্রমে রুপো এবং ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

রিওতে যাবার আগে ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে ভারতীয়রা ১০-১৪টা পদক পেতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। বাস্তবে সেরকম হয়নি। এই বিষয়ে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (সাই) ডিরেক্টর জেনারেল ইনজেত্তি শ্রীনিবাস দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর টাস্ক ফোর্স সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এতদিন ক্রীড়াক্ষেত্রে যে কোনো উদ্যোগ ক্রীড়াসংস্থাগুলিই নিত। ক্রীড়ামন্ত্রকের শুধু নজরদারির দায়িত্ব ছিল। এই প্রথম দেশের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি এগিয়ে এলেন। সুতরাং সকলেই আশায় বুক বাঁধছেন। স্বপ্ন দেখছেন পদক খরা কাটিয়ে ২০২০-র টোকিও থেকে ভারত নিশ্চয়ই হাসিমুখে ফিরবে।

কয়লা কলেঙ্কারিতে ফের জড়াল মনমোহন সিং-য়ের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কয়লা কেলেঙ্কারিতে আরও একবার জড়াল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-য়ের নাম। সম্প্রতি দুটি পৃথক মামলার দুই অভিযুক্ত প্রাক একই সুরে বলেন কয়লা খনি বিতরণের ব্যাপারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং কয়লামন্ত্রী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মনমোহন সিং-ই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অভিযুক্ত সংস্থা ছত্তিশগড়ের জেএলডি ইয়াওয়াতমল এনার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের তরফ থেকে সরাসরি মনমোহন সিং-য়ের নাম করা হয়। আর এক অভিযুক্ত তৎকালীন খয়লাসচিব এইচ সি গুপ্তা বিশেষ আদালতের কাছে কয়লামন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিং-য়ের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেন। ফতেপুর কয়লাখনি বিতরণ মামলায় অভিযুক্ত সংস্থাটি জানায় এই মামলায় কয়লামন্ত্রকের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে যদি এইচ সি গুপ্তা অভিযুক্ত হতে পারেন তাহলে বিভাগীয় মন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিং-য়ের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ থাকা উচিত।

জাকির নায়েক সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন জুগিয়েছে : কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইসলামি ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েক মুসলমান যুবকদের সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করছে— এমন তথ্য প্রকাশ করেছে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা। জানা গেছে, এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসের মামলায় অভিযুক্ত ৫০ জনের বেশি জানিয়েছে তারা পিস টিভিতে জাকিরের বক্তৃতা শুনে সন্ত্রাসবাদের প্রেরণা পেয়েছে। জুলাইয়ে ঢাকা হামলার মূল পাণ্ডারা জাকিরের বক্তৃতায় উৎসাহিত হয়েছে বলে খবর। ২০০৬ সালে ঔরঙ্গাবাদে বিপুল অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ফিরোজ দেশমুখও স্বীকার করেছে, সে পিস টিভিতে জাকিরের ভাষণ শুনে উৎসাহিত হয়েছে। একইভাবে স্বীকারোক্তি দিয়েছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের কাতিল আদমেদ সিদ্দিকি, আফশা জাবিন, মুদাব্বির শেখ, মহম্মদ ওবাইদুল্লা খান, আবু আসান ও মহম্মদ নাফিস খান।

সূত্রে খবর, দেশব্যাপী সন্ত্রাসে উৎসাহ, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো এবং ধর্মান্তকরণে যুক্ত জাকির ও তার ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা ইউপিএ প্রয়োগ করতে চলেছে। এর ফলে জাকিরের ওপর সন্ত্রাসবাদী মামলা করা হবে এবং নিষিদ্ধ করা হবে তার এন জি ও।

উবাচ

“ভারতের ক্রম-পরিবর্তন নয়, দ্রুত পরিবর্তনই আমার জীবন-দর্শন (ভিশন)।”

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নীতি-আয়োগের বার্ষিক বৈঠকে

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“কৃত্রিম গর্ভধারণে (Surrogate) নারীর অধিকার রয়েছে— এটা স্বীকার করেও বলা যায় একটি সীমারেখা টানা দরকার।”

এক সাক্ষাৎকারে।

নির্মলা সীতারামন
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী

“সুইটহার্ট চুক্তি ঘুষেরই রকমফের। এটা জনগণের সম্পদকে লুটের শামিল।”

গুরুগ্রামের জমি চুক্তি নিয়ে বিচারপতি এম এন ধিংড়ার কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে।

অশোক খেমকা
আই এ এস অফিসার

“যাত্রা শুরু হয়েছে। তোমরা আমাদের এরকম উৎসব পালনের অনেক সুযোগ দেবে।”

পিভি সিন্ধু, সাক্ষী মালিক ও দীপা কর্মকার-কে এক সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে।

শচিন তেণ্ডুলকর
প্রাক্তন ক্রিকেটার

“‘স্বামী যদি মাতাল চরিত্রহীন অসুস্থ বা অক্ষম হয় তা হলে মুসলমান মেয়েরা তালাক দিতে পারে। তবে মেয়েদের উচিত নিকাহের সময়েই এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলে নেওয়া।’”

ইসলামে মেয়েদের তালাক দেবার অধিকার প্রসঙ্গে।

মুফতি সেলিম নুরি
দারুল ইফতা-র ফতোয়া বিভাগের প্রধান

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বন্ধুহীন অবস্থার জন্য দায়ী বিগত মনমোহন সিংহের ইউপিএ সরকার

গত সপ্তাহে কাশ্মীরের অশান্ত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছিলাম যে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারত আক্রমণের অছিলা খুঁজছে। পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ চলতি সপ্তাহে জানিয়েছেন যে কাশ্মীরের মানুষকে ভারতীয় সেনার নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব পাকিস্তানের। ভবিষ্যৎ পাক-ভারত যুদ্ধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জনমত যাতে ভারতের বিরুদ্ধে যায় তার জন্য পাকিস্তান সরকার সেদেশের ২২ জন বাছাইকরা সাংসদকে নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল গড়েছে। এই প্রতিনিধিদল বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রের রাজধানীতে যাবে। উদ্দেশ্য, কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার অত্যাচারের কাহিনী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। নওয়াজ শরিফের ধারণা ভারত-বিরোধী লাগাতার প্রচারের ফলে কাশ্মীর যুদ্ধে ভারত কোনো বন্ধুরাষ্ট্রকে পাশে পাবে না। অতীতে কাশ্মীর প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে পাশে ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। সেই রাশিয়ায় এখন সোভিয়েত কমিউনিস্ট শাসন নেই। শক্তিহীন রাশিয়া এখন সুদূর কাশ্মীরে ভারত-পাক সংঘর্ষে নাক গলাবে না। বিশেষত যখন আমেরিকা পাকিস্তানের বন্ধু। সোভিয়েত আমলে ভারত-রুশ মৈত্রী চুক্তি ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে আমাদের দেশের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ ছিল। রাশিয়ার বর্তমান শাসকেরা কমিউনিস্ট আমলের মৈত্রী চুক্তি বাস্তবে কতটা মেনে চলবেন তা নিয়ে সংশয় আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বন্ধুহীন অবস্থার জন্য দায়ী বিগত মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ সরকার। বিগত সেই সরকারের আন্তর্জাতিক কূটনীতি বলতে কিছুই ছিল না। আমেরিকার পদলেহন করা ছাড়া তারা অন্য কিছুই করেনি। এতে লাভ হয়নি কিছুই। কারণ, পাক-ভারত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমেরিকা পাকিস্তানকেই সমর্থন করবে তা জানা কথা। অথচ আমাদের ঘরের কাছেই ভারত সমর্থক ইজরায়েল আছে। আমরা মুসলমান তোষণ করতে গিয়ে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী চুক্তি করিনি। এটাই আমাদের বড় ব্যর্থতা।

গূঢ় পুরুষের কলম

আমরা মুসলমানের জেহাদকে বড়ই ভয় পাই। আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে বহুবার যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। আমরা প্রতিরোধ করেছি মাত্র। জয়ী হওয়া সত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমিও দখল করেনি। তবু ব্যর্থ কূটনীতির জন্য তথাকথিত শান্তিকামী বিশ্ব ভারতের পাশে নেই।

আগামী নভেম্বর মাসে পাকিস্তানে সার্কভুক্ত দেশগুলির সম্মেলন হওয়ার কথা। এই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিত থাকার কথা। তবে সম্মেলন আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-বিরোধী জিগির তুলতে সার্কের মঞ্চকে ব্যবহার করবে। যদিও সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অবাধ ও সহজ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়তেই সম্মেলন ডাকা হয়েছে। রাজনৈতিক আক্রমণের জন্য নয়। সেকথা পাকিস্তানকে বোঝানো সম্ভব নয়। কথায় আছে, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'। ভারতীয় জনমতের একটা বড় অংশ চাইছে যেন নরেন্দ্র মোদী সার্ক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব না করেন। কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা গলাচ্ছে। সম্প্রতি ইসলামাবাদে সার্কভুক্ত দেশগুলির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে হেনস্থা করা হয়। কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে তিনি কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না তার কৈফিয়ৎ তলব করেন পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ রাজনাথ সিং পাকিস্তানের দেওয়া মধ্যাহ্নভোজ বাতিল করে ভারতে ফিরে আসেন। লক্ষণীয় যে দুই প্রতিবেশী দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাদানুবাদ চলার সময় বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা নীরব ছিলেন। কাশ্মীরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সে ব্যাপারে পাকিস্তান নাক গলাতে পারে না। রাজনাথ সিংয়ের এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি শব্দও খরচ করতে দেখা যায়নি বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের ভূমিকা চিরকালই রক্ষণাত্মক। সম্ভবত, দু'শো বছরের পরাধীনতার গ্লানি আমাদের বিদেশনীতিকে নপুংসক করে দিয়েছে। মুসলমানদের প্রতিনিয়ত হিংস্র আক্রমণের প্রতিরোধে ইজরায়েল যেভাবে পাল্টা মার দিয়ে চলেছে তাকে সেলাম জানাতে হয়। মারের জবাব পাল্টা মারেই দিতে হয় এই সহজ সরল কূটনীতির জন্য পশ্চিম দুনিয়ার রাষ্ট্রজোট আজ ইজরায়েলকে হিরোর মর্যাদা দিচ্ছে। নপুংসক রাষ্ট্রনীতি দেশকে সম্মান এনে দেয় না। পাকিস্তান যদি কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য মনে না করে আমাদেরও অধিকার আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলঘিট-বাল্টিস্তান এলাকাকে পাক অধিকৃত অঞ্চল বলে স্বীকার না করার। সেখানে সক্রিয় পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে ভারত সামরিক হস্তক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করতেই পারে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ভারতের কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারে। কিন্তু আমরা চাইতে পারি না। এ একমন কূটনীতি? ■

মানস সরোবরে হাবুডুবু অধীর

মাননীয় অধীর চৌধুরী
সভাপতি, প্রদেশ কংগ্রেস
বিধান ভবন, সিআইটি রোড, কলকাতা

ভাই বিকাশ চলে গিয়েছে। কিন্তু দাদা মানস ভুঁইয়াকে গেলাও যাচ্ছে না! ওগরানোও যাচ্ছে না। বেজায় ফ্যাসাদে পড়েছেন আপনি। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাজটাই ফ্যাসাদের। যখন মানসবাবু ওই পদে ছিলেন তখন আপনাকে নিয়ে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি।

আপনি তো তাঁকে সাসপেন্ড করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। কিন্তু সাসপেন্ড করলেও মানস দলে থেকে আপাতত যা করছেন, তাই করে যাবেন। কংগ্রেসের হুইপটা মানলেই হলো। আর বহিষ্কার করলে তো পোয়াবারো! দলহীন বিধায়ক হয়ে পাঁচটা বছর কাটিয়ে দিতে পারবেন। চাই কী ইস্তফা দিয়ে আবার সবং থেকে জিতে আসতে পারবেন তৃণমূলের টিকিটে। সঙ্গে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান থাকবেন। বিরোধীরা তাঁর ডাকা বৈঠক বয়কট করতে পারেন। তাতে তাঁর কিছু যাবে-আসবে না।

বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের ঘরে যাতায়াত নিয়ে পরোক্ষে মানসকে 'হেনস্থা'র আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন মান্নান। তাঁর কথায়, ''কংগ্রেস পরিষদীয় দল মানস ভুঁইয়াকে বয়কট করছে। তিনি পরিষদীয় দলের ঘরে আসতেই পারেন। কিন্তু কোনো বিধায়ক তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে তার দায় মানস ভুঁইয়ার।'' কখনও মান্নান প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে মানস মানিকতলার ফ্ল্যাটটি পেয়েছেন। কখনও প্রশ্ন তুলেছেন, বিধায়ক না-থাকা সত্ত্বেও মানস কীভাবে কিড স্ট্রিটের বিধায়ক আবাসে থেকেছেন। কখনও টেনে এনেছেন মানুসের সঙ্গে সাবেক বাম সরকারের 'ঘনিষ্ঠ' যোগাযোগের প্রসঙ্গ। এমনকী, তাঁর সঙ্গে মানসের কোথায় ফারাক, তাও বোঝাতে ছাড়েননি মান্নান। বলেছেন, 'আমি কখনও কারও কাছে হাত পাতি না। আমার রাজনৈতিক ইতিহাস সকলে জানেন!' মান্নানের অব্যবহিত পরেই বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন আপনি। সেখানে মানস-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে অধীরবাবু আপনি স্পষ্টই বলেছেন, ''কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফে মানুষ ভুঁইয়ার সাসপেনশনের সুপারিশ করে আমাকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেটি আমি এআইসিসি'র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এ কে অ্যান্টনির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছি।'' আপনি তো মান্নান সাহেবের থেকেও আক্রমণাত্মক হয়ে বলেছেন, ''ও (মানস) তৃণমূলের কুনকি হাতি! সুপারি নিয়ে দল ভাঙানোর চেষ্টা করছে। ওকে দ্রুত সাসপেন্ড এবং বহিষ্কার করার জন্য আমরা বলেছি।''

খেলা জমিয়ে দিয়েছেন মানসও। ধুরন্ধর এবং 'মজা' দেখতে মশগুল মানস উল্টে দল এবং বিরোধী দলনেতার হুঁশিয়ারিকে সহানুভূতি আদায়ের 'অস্ত্র' হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর কথায়, ''আমি ওই ঘরের (পরিষদের দলের ঘর) জলস্পর্শও করব না! বিধানসভার প্রধান স্পিকার। আমি তাঁকে জানাব, অধীরের উপদেশে এবং মান্নানের নেতৃত্বে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্থার শিকার হতে পারি!'' আপনাকেও জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, ''কুনকি হাতি আর সুপারির কথা বলে নোংরাভাবে আমায় আক্রমণ করছেন। সুপারি তো সমাজবিরোধীদের মুখের ভাষা! তিনি কি ওটা মুখ ফস্কে বললেন? নাকি ওটা নিজের কৃতকর্মের বহিঃপ্রকাশ? অধীর-মান্নান এখন জগাই-মাধাই হিসেবে প্রতিযোগিতায় নেমেছে কংগ্রেস সংস্কৃতিটা নষ্ট করতে!''

মান্নানের পাল্টা সাংবাদিক বৈঠকটি বিধানসভা ভবনেই করেছেন সবংয়ের বিধায়ক। কখনও হাতজোড় করে নমস্কারে, কখনও ডান হাতের পাঁচ আঙুল কপালে তুলে স্যালুট করে মান্নানকে 'গ্রেট লিডার' বলে তীব্র কটাক্ষে বিঁধেছেন। 'দলবিরোধী' কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত নন বলে দাবি করে মানস বলেছেন, ''সিপিএমের সঙ্গে থাকতে থাকতে আলিমুদ্দিনের সংস্কৃতিটা ভালই রপ্ত করেছেন মান্নান। মনের কথা এতদিন চেপে রাখতে পারলেও যা ভাবছিলেন, তা প্রকাশ পেয়েছে।'' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ''মান্নান মানসিক অবসাদে ভুগছেন। তিনি চাইলে ভাল চিকিৎসকের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।''

অধীরবাবু, একে দলের অবস্থা শোচনীয়। রাজ্যে তো বটেই দেশেও। রাহুল কেন সোনিয়া গান্ধীরও ক্ষমতা নেই এই সঙ্কট মেটানোর। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই পারেন। তিনিই যদি মানসকে ভাই বলে কাছে টেনে নেন তবেই মিটে যায়। দেরি যে কেন করছেন কে জানে!

—সুন্দর মৌলিক

বাংলা ও ইংরেজিতে এরাজ্যের নাম থাক পশ্চিমবঙ্গ

ধীরেন দেবনাথ

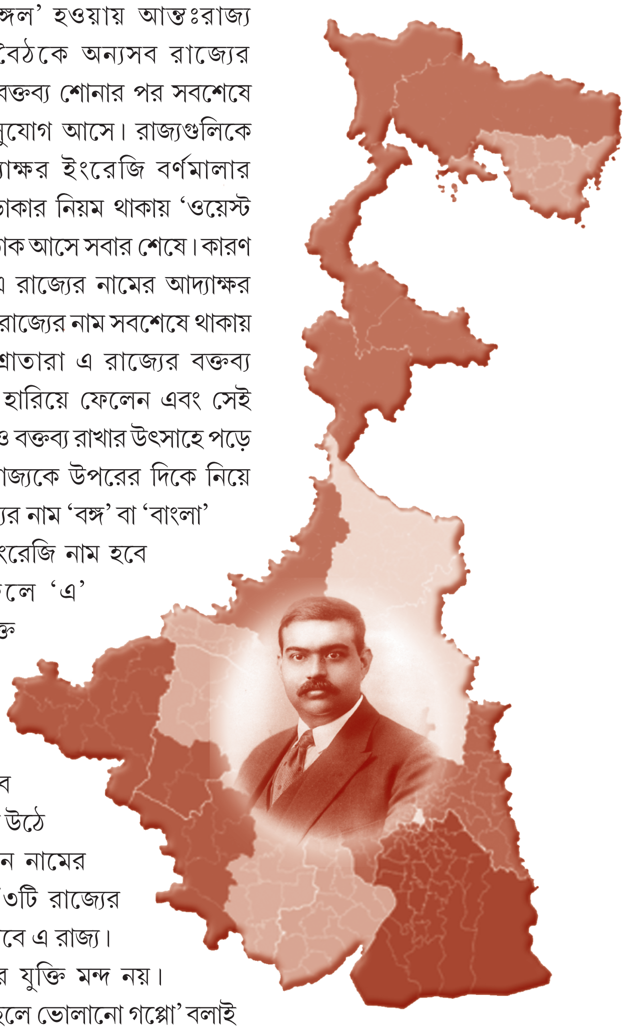

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরাজ্যের নাম বদলাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। রাজ্য মন্ত্রীসভায় ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাশও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, রাজ্যের নাম বদলাতে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ এতটা উদ্যোগী হলেন কেন? আর কেনই বা তিনি পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে ‘বঙ্গ’, ‘বাংলা’ বা ইংরেজিতে ‘বেঙ্গল’ করতে চান? তাঁর যুক্তি, ইংরেজিতে রাজ্যের নাম ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’ হওয়ায় আন্তঃরাজ্য পরিষদের বৈঠকে অন্যসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বক্তব্য শোনার পর সবশেষে তাঁর বলার সুযোগ আসে। রাজ্যগুলিকে নামের আদ্যাক্ষর ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে ডাকার নিয়ম থাকায় ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’-এর ডাক আসে সবার শেষে। কারণ ইংরেজিতে এ রাজ্যের নামের আদ্যাক্ষর ‘ডব্লুউ’। আর রাজ্যের নাম সবশেষে থাকায় স্বভাবতই শ্রোতারা এ রাজ্যের বক্তব্য শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং সেই সুবাদে বক্তারও বক্তব্য রাখার উৎসাহে পড়ে ভাটা। তাই রাজ্যকে উপরের দিকে নিয়ে আসতে রাজ্যের নাম ‘বঙ্গ’ বা ‘বাংলা’ হোক, যার ইংরেজি নাম হবে ‘বেঙ্গল’। ফলে ‘এ’ আদ্যাক্ষরযুক্ত রাজ্যগুলির পরেই ‘বি’ আদ্যাক্ষরযুক্ত রাজ্য হিসেবে এরাজ্যের নাম উঠে আসবে। তখন নামের তালিকায় ২/৩টি রাজ্যের পরেই ঠাঁই পাবে এ রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি মন্দ নয়। তবে একে ‘ছেলে ভোলানো গপ্পো’ বলাই শ্রেয়। কারণ আন্তঃরাজ্য পরিষদ একটি সরকারি তথা সাংবিধানিক সংস্থা। তাই প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধির উচিত ধৈর্যসহকারে বক্তব্য শোনা। এটা সৌজন্যের প্রদর্শন এবং সাংবিধানিক কর্তব্যও বটে। তবুও ছ’ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকে কেউ কেউ অধৈর্য হয়ে পড়লে একদিনের বৈঠক দু’দিনে করা হোক। সেটা সম্ভব না হলে কোনো বৈঠকে প্রথমেই শেষ থেকে নাম ডাকা হোক। আবার অন্য এক বৈঠকে প্রথম রাজ্যের পর ডাকা হোক শেষ রাজ্যকে। আর এই নিয়মেই ডাকা হোক রাজ্যগুলিকে। তাহলে আর বারবার এ রাজ্যকে শেষে ডাকার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে না। কোনো সমস্যা হলে তার সমাধানের পথও খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু তা না করে রাজ্যের নাম পাল্টে উপরে ওঠার এই প্রবণতা কী রাজ্যে রাজ্যে সংক্রামিত হবে না? রাজ্যে রাজ্যে নাম বদলের হিড়িক পড়বে না? আর সেটা কী রাজ্যগুলির মধ্যে রেষারেষি, অবিশ্বাস ও তিক্ত সম্পর্কের জন্ম দেবে না? তাছাড়া এই সুবিধাবাদী প্রচেষ্টা কী ভারতের সুমহান গণতন্ত্র, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, সুপ্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিপন্ন করবে না? ভেবে দেখা প্রয়োজন।

অতঃপর রাজ্যের নাম পরিবর্তিত হয়ে ‘বেঙ্গল’ হলে তালিকার সবশেষে নেমে আসবে উত্তরপ্রদেশ। তখন সে কী উপরে ওঠার তাগিদে রাজ্যের নাম বদলে হবে ‘নর্থ প্রভিন্স’? উত্তরাখণ্ড কী হবে? পরবর্তীতে ত্রিপুরা হবে কী কুমিল্লা? কারণ ত্রিপুরা কুমিল্লারও অংশ। উল্লেখ্য, পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাব (পাকিস্তান) পঞ্জাব নামেই পরিচিত। তাহলে তামিলনাড়ু কী করবে? যদিও উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু তালিকার শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের একটু উপরে রয়েছে তবুও তো তারা উপরে ঠাঁই পেতে এরাজ্যের ন্যায় নাম বদলাতে উঠে পড়ে লাগেনি। তাছাড়া শুধু এরাজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, উল্লিখিত রাজ্যগুলির নাম শেষের দিকে থাকায় শ্রোতারা ওইসব রাজ্যের বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কই, তারা তো এ রাজ্যের মতো অভিযোগ তুলছে না। কে শুনলেন, কে না শুনলেন বা কে ধৈর্য হারালেন তা নিয়ে তো তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ উত্তর উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু এরাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। আসলে এরাজ্যের বক্তব্যে কোনো সারবত্তা নেই। অন্যান্য রাজ্যের কাছে এরাজ্য নিছকই একটা গণতন্ত্র হত্যাকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত, বিশৃঙ্খল ও পিছিয়ে পড়া রাজ্য। বক্তব্যের ফিরিস্তিতে গালভরা উন্নয়ন ও অগ্রগতির কথা থাকলেও শ্রোতাদের কাছে তা অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তাই গুরুত্বহীন এরাজ্যের

বিবৃতির বারমাস্যা তাঁরা আগ্রহভরে শুনতেও চান না। তাছাড়া একঘেয়েমি কথাবার্তা কারই বা ভালো লাগে? এরাজ্য শ্রোতাদের শোনার আগ্রহ ও আকর্ষণ জাগাতে ব্যর্থ। আর ব্যর্থ হবে নাই বা কেন? এরাজ্যের 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার যেভাবে উন্নয়নের টাকা উৎসব, মোচ্ছব, খেলা, মেলা, দান, খয়রাতি, অনুদান, ভাতা, বৃত্তি, সাথী ও সরকারের উন্নয়নের ঢাক পেটানোর পিছনে খরচ করছে এবং সেই ঘাটতি পূরণে প্রায় প্রতিমাসে বাজার থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে রাজ্যকে দেনার দায়ে ও অনুন্নয়নের জালে জড়িয়ে ফেলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনীতি করছে তা কী কারো অজানা? তাই দোষ শ্রোতাদের নয়, দোষ এরাজ্যের। মুখ্যমন্ত্রীর জানা উচিত, এরাজ্যকে দেখে কোনো কোনো রাজ্য যদি রাজ্যের নাম বদলে উদ্যোগী হয়ও তবুও কোনো একটি রাজ্যকে তো সবার শেষে থাকতেই হবে। তাই বলে কী তার উন্নয়ন ও অগ্রগতি হবে না? শেষে বলে হাত তুলে দেবে?

সত্যি বলতে কী, রাজ্যের নাম বদলের উদ্যোগের পিছনে যেমন রয়েছে সরকারের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও মদতপুষ্ট সমাজবিরোধী এবং শাসকদলের এক শ্রেণীর নেতা-কর্মীর দুর্নীতি, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, রাহাজানি, খুন-খারাপি, ধর্ষণ, নির্যাতন, বেকারত্ব, স্বজনপোষণ, অনুন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, ভোট ডাকাতি, হুমকি, ধমকি ও শাসকদলের দলদাসে পরিণত হওয়া পুলিশ-প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার দিকে থেকে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া তেমনি রয়েছে রাজনৈতিক উচ্চাশা ও গভীর ষড়যন্ত্র।

দ্বিজাতিতত্ত্ব বা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সময় গোটা বাংলাটাই পাকিস্তানে যেতে বসেছিল। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু মহাসভার অবিসংবাদিত নেতা ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে হিন্দুগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গকে করেছিলেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় পশ্চিমবঙ্গও চলে যেত পাকিস্তানে। শ্যামাপ্রসাদই 'a partition within a partition'-এর করে করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। সেই সুবাদে শ্যামাপ্রসাদই হলেন পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা বা জনকে। এই শ্যামাপ্রসাদই সংসদে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত নেহরুর উদ্দেশ্য বলেছিলেন, "You divided India, I divided Pakistan." ওদিকে ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্বপাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গ থেকে নির্যাতিত, নিগৃহীত ও বাস্তুচ্যুত হিন্দুরা দলে দলে উদ্বাস্তুর তকমা নিয়ে ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই নেয়। একমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে বহু হিন্দু এদেশে বা এবঙ্গে এসে রাতারাতি বনে যান কমিউনিস্ট, সেকুলারিস্ট বা সর্বধর্ম সমন্বয়কারী। তাঁরা ভুলে গিয়েছেন, বরং বলা ভালো, রাজনৈতিক স্বার্থে ভুলতে বাধ্য হয়েছেন দেশভাগের যন্ত্রণা, পূর্ববঙ্গ ত্যাগ, কলকাতা ও নোয়াখালির কুখ্যাত দাঙ্গা, মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত উৎপীড়ন, ধর্ষণ, অপহরণ, লুণ্ঠন ও ভিটেমাটি থেকে বিতাড়ন এবং শ্যামাপ্রসাদের অবদান। তবে তা সত্ত্বেও আজও এপার এবং ওপার বাংলার অসংখ্য হিন্দু ভোলেনি সেসব হৃদয় বিদারক স্মৃতি। আজও ওপার বাংলার কথা মনে পড়লে বহু হিন্দুর চোখে জল আসে, মন হয় চঞ্চল ও ভারাক্রান্ত। তাদের দলে আমিও একজন। আর প্রতিটি রাজ্যেরই রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, আচারবিধি, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য। পশ্চিমবঙ্গেরও সেসব রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের বিশেষত্ব এই যে এর সঙ্গে জড়িত দেশভাগ, বঙ্গভঙ্গ ও উদ্বাস্তুদের ভাবাবেগজনিত ঘটনা। এ রাজ্যের সেকুলারবাদী তথা সংখ্যালঘু তোষণকারী সরকার সেই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চাইছে—মুছে ফেলতে চাইছে এ রাজ্যের ইতিহাস থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনক হিন্দুপ্রেমী ড. শ্যামাপ্রসাদের নাম এবং ভুলিয়ে দিতে চাইছে হিন্দুদের মন থেকে হিন্দুত্বের চেতনাকে, পূর্ববঙ্গ ত্যাগের যন্ত্রণাকে। আবার পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে উদ্বাস্তু ও তাদের বংশধরদের স্মৃতি থেকে উদ্বাস্তু হওয়ার কারণ ও যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে মুছে যাবে। তাছাড়া রাজ্যের নতুন নামকরণের সুবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এরাজ্যের ইতিহাসে ঠাঁই পাবে। যেমন, 'পশ্চিমবঙ্গের নামের বদলে অনেক অসুবিধাও আছে। যেমন, তখন বিধানচন্দ্রকে আর 'পশ্চিমবঙ্গের রূপকার' বলা যাবে না। তাছাড়া দুই বঙ্গ নিয়েই গোটা বঙ্গ। তাই পশ্চিমবঙ্গকে বঙ্গ বা বাংলা বলা অনুচিত হবে। তাই রাজ্যের নাম বদলালে এরাজ্যের ইতিহাসটাই বদলে যাবে। তার চেয়ে বরং রাজ্যের নাম বাংলা ও ইংরেজিতে হোক 'পশ্চিমবঙ্গ'। যেমন 'ক্যালকাটা' নাম বদলে বাংলা ও ইংরেজিতে হয়েছে 'কলকাতা'। আর তাতে রাজ্যের নাম অনেক উপরে উঠবে, রাজ্যের নাম শেষে— এই অপবাদ ঘুচবে এবং 'সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না'। বিগত ছয় দশকে এরাজ্যের কোনো সরকারই রাজ্যের নাম বদল করেনি, অজুহাতও দেখা যায়নি। তারা রাজ্যের উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। এ সরকারও সেই পথ অনুসরণ করুক। নাম বদল করলেই কী রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইবে? সেই গ্যারান্টি কী এই সরকার দিতে পারে? মনে রাখতে হবে, নাম নয় কামটাই আসল। আর সেটাই গুণীজনদের কথা।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান

‘শিক্ষার এই ঘোর আঁধারে তোমারে খুঁজি হে ধ্রুবতারা’

ড. তুষারকান্তি ঘোষ

৫ সেপ্টেম্বর ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ছিলেন বলেই যে তাঁর জন্মদিনকে ‘শিক্ষক দিবস’ রূপে পালন করা হয় ঠিক তা নয়। তিনি আজন্ম আদর্শবাদী শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক তো ভারতের মাটিতে কম ছিল না। অজস্র ঋষি এই ভূমিতে আচার্যের ব্রত পালন করেছেন। তাঁদের জীবন-বেদের শ্রেষ্ঠ সামগান ঝঙ্কৃত হয়েছে তাঁদের প্রাণের ছাত্রদের বিকাশ ও পূর্ণতার স্বাধীনতায়। রাধাকৃষ্ণান ভারতের অজস্র নক্ষত্রকুলের ছায়াপথে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরাধীন দেশে তাঁর শিক্ষকতার আদর্শ ছিল বিশ্বের অনুকরণযোগ্য।

শিক্ষকতার পেশা অত্যন্ত কঠিন। বিদ্যালয় প্রেরিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তাঁকে শিক্ষক তালিকা ভুক্ত করলেও একজন শিক্ষকের সাধনা সমগ্রজীবন ধরে। ব্যক্তিগত জীবন ও সার্বজনীন জীবন দুটোরই সাধনার অঙ্গীকার শিক্ষককে গ্রহণ করতে হয়। আদর্শবাদী ও মহতী জীবনবোধের অধিকারী শিক্ষককে তাঁর চলার পথে চরৈবেতির মন্ত্র নিয়ে মার্গের সন্ধানের জন্য অগ্রসর হতে হয় তখন তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন গুণের বিকাশের প্রয়োজন হয়।

এই গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রথম ক্ষেত্র হলো— শিক্ষক জীবনের জ্ঞান সাধনা। অধ্যয়ন হলো শিক্ষক জীবনের চলার পথের প্রথম মাইলস্টোন। প্রাচীনকালে বিদ্যাভ্যাস যখন মৌখিক রীতিতে হোত তখন শিক্ষক ছিলেন চলন্ত গ্রন্থাগার— A moving Library। রাধাকৃষ্ণানের জীবনে এই জ্ঞানচর্চা শেষ দিন অবধি ছিল।

ছাত্রজীবনে পড়াশোনা যেন গোগ্রাসে গিলতেন। সত্যকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। তিনি জীবনের অধ্যয়নকে মহাবিশ্বের সকল জাগতিক ও পরমার্থিক শক্তিকে জানার ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। তিনি যে সময় থেকে নিজের সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়েছেন তিনি অনুভব করেছেন ঈশ্বরীয় বিশ্বাসের মহোত্তম সার্বভৌমিকতা— তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, তিনি সমূহের প্রশাসক, সত্য ও সৌন্দর্যের তিনিই প্রকাশক। এই অধ্যাত্ম চিন্তন যাঁর জীবনে ধন রূপে সঞ্চিত তিনি বিশ্বের সর্বত্রই নিজেকে প্রকাশ করবেন অমিত সূর্য বিক্রমে। তাঁর জীবনে এই প্রকাশ ঘটেছিল শিক্ষকতার কার্যে। একজন শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে সারা জীবনের ছাত্র। রাধাকৃষ্ণান তাই ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্বভাবজ উক্তি, “If I can boast of anything it is that as a student I tried to do my best and I rimed at doing my best.” এই জ্ঞান আহরণের কার্যশীলতাই তাঁর জীবনের প্রথম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

একজন শিক্ষকের জীবনের সার্থক প্রকাশ যে তিনি অধ্যাপনার কালে তাঁর অধীত বিদ্যা শ্রেণীকক্ষে উজাড় করে দেবেন। তাঁর শ্রেণী কক্ষগুলো হবে তপোবনের জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ বিচরণ ক্ষেত্র। ১৯০৯ সালে ড. রাধাকৃষ্ণান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পেলেন। ড. সাথিয়ানাথন ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের প্রফেসর। রাধাকৃষ্ণান তাঁর লম্বা সাদা কোর্ট ও মাথায় পাগড়িবাঁধা অবস্থায় যখন ছাত্রদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন সেদিন তাঁকে কোনো ছাত্র তেমন ভাবে লক্ষ্য করেননি। কিন্তু যখন তিনি শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে শুরু করলেন ছাত্রেরা গভীর পাণ্ডিত্য, জটিল বিষয়কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ভেঙে ভেঙে পড়ানোর অপূর্ব কৌশল, তাঁর সহজ সরল বাক্য— যেন এক একটা যুগের পাণ্ডিত্যের নির্যাস রূপে উঠে আসতো ছাত্রদের কাছে। তাঁর ভাষা-জ্ঞান এবং অপূর্ব বাগ্মীতা শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালগুলোকে অবধি নিস্তব্ধ করে তুলত। তাঁর বাক্য যেন থরে থরে সাজানো হয়ে যেত এক অবিস্মরণীয় অনুভূতির শীর্ষে ছাত্রদের মনের অভ্যন্তরে। সমস্ত বাক্য যা শ্রেণীকক্ষে তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে উচ্চারিত হোত— প্রতিটি বাক্যের মধ্যে ছিল এক সুশৃঙ্খল বন্ধন— কোনো একটি বাক্যও অপ্রয়োজনীয় ছিল না পাঠদানের অমৃতসত্তা থেকে।

রাধাকৃষ্ণান পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাসে বিষয়বস্তুর অবতারণা করতেন কুড়ি মিনিট। এই কুড়ি মিনিটের জ্ঞানগর্ভ পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক অলোচনাই ছাত্রদের মস্তিষ্কের মধ্যে ধরে রাখা কঠিন ছিল। দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য তিনি চলে যেতেন পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য। এই সময়টুকু ছিল রাধাকৃষ্ণানের জীবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষার সময়। কী অপূর্ব নিষ্ঠায় তিনি তাদের তুলে ধরতেন মূল স্রোতে! আলবের কামু বলেছেন, 'যারা আদর্শবাদী তারা তাদের সান্নিধ্যের মানুষকে টেনে তোলেন পর্বত শিখরে যেন বিশাল প্রস্তরখণ্ডের মতো।' রাধাকৃষ্ণান টেনে তুলতেন তাঁর ছাত্রদের পর্বত শিখরে। রাধাকৃষ্ণান এই সময়টুকু শ্রেণীকক্ষে সকল ছাত্রদের কাছে ছিলেন ত্রাতার ভূমিকায়। বাকী অংশের পাঁচ থেকে সাত মিনিট নিজের পাঠদানের বিষয়কে পুনরায় তুলে ধরতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। শেষ সময় ছাত্রদের সঙ্গে ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে আলোচনা করতেন। যখন তিনি শ্রেণীকক্ষ হতে বের হয়ে আসতেন সকল ছাত্র এক অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করতেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি যা তাঁর প্রিয় ছাত্র বোসানকেটের মুখ হতে নির্গত হয়েছিল। বোসানকেট বলেছেন, "Whatever he taught, none failed to grasp. The impact of his short leetures was so great that the words he used rang in the ears of his students even 50 years later." শিক্ষকের জীবনবোধের জীবন্ত দলিল হলেন রাধাকৃষ্ণান।

১৯১০-এ রাধাকৃষ্ণাণকে যেতে হয়েছিল L.T. (Licentiate in Teaching)-এর জন্য। কারণ তাতে তিনি অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসরের পদে উন্নীত হতে পারবেন। সৈদপেট নামক স্থানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলেন। এই কলেজের সাইকোলজির অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণানের কাছে বলেছিলেন, আমি আপনাকে আমার ক্লাসে উপস্থিত হওয়া থেকে মুক্তি দিচ্ছি কারণ আপনাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।"

এই শিক্ষণ কলেজে এক ঘটনা ঘটল। বহু অধ্যাপক-ছাত্ররা সাইকোলজি বিষয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন, তারা রাধাকৃষ্ণানকে অনুরোধ করলেন তাঁদের পিছিয়ে পড়াটা যেন তিনি পূর্ণ করে দেন (To make up their short comings and deficiency)।

উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাজ্যসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন ড. রাধাকৃষ্ণান।

রাধাকৃষ্ণান এইসব অধ্যাপক-ছাত্রদের জন্য বেশ কিছু ক্লাস নিলেন যাতে তাদের পরীক্ষায় কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু এখান থেকেই উঠে এল আরেক বিচিত্র ইতিহাস। রাধকৃষ্ণানের এই শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের বিষয়গুলো একত্রিত করে কলেজ কর্তৃপক্ষ লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশ করলেন এক গ্রন্থ— যার নাম 'Essentials of Psychology"।

আসলে শিক্ষক-জীবন জ্ঞান সাধনার জীবন। যে জীবনের মহোত্তম গুণ হলো ছাত্রদের প্রতি অপূর্ব স্নেহের বিকিরণ। ১৯১৬ সালে রাধাকৃষ্ণানকে অন্ধ্রের রাজমণ্ড্রী কলেজে প্রফেসর পদে বদলি করা হলো। যত বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি এলেন তত তাঁর হৃদয়ের প্রসারণ ঘটলো। তাঁর প্রিয় ছাত্র কে. ঈশ্বর দত্ত স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "স্যার যে বাড়িতে থাকতেন তার বারান্দায় সকালবেলা তিনি বসে বই পড়তেন। রাস্তার পাশে থাকায় সমস্ত পথযাত্রী রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরা রাধাকৃষ্ণানের কাছে পড়া বুঝে নিত। এমনকী আমার ভাইবোনেরাও রাধাকৃষ্ণানের কাছে যেত। ভাঙা ভাঙা ভুল ইংরেজি শব্দের সাহায্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতো। স্যার সকলের আপন ছিলেন।"

এই আপনত্ব শিক্ষকের চিদ-বৃত্তির কর্ষণভূমি সঞ্জাত স্বর্ণফসল। মানুষের মধ্যে সত্য ও অমরত্বের সহজ প্রকাশ দেখাই শিক্ষকের জীবন সাধনার পরম পাথেয়। এই বিশ্বজনীন সামাজিক সম্পর্ক হৃদয়ের উৎসভূমি হতে উঠে আসে এক চৈতন্য প্রজ্ঞায়। রাধাকৃষ্ণান সেই প্রজ্ঞার মানুষ ছিলেন।

১৯১৮-তে রাধাকৃষ্ণান মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মহারাজা কলেজে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক হয়ে এলেন। এই সময় মালদহের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দুই কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ বিনয় কুমার সরকার ও রাধাকুমুদ মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

এই কলেজে এসে রাধাকৃষ্ণান জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের চরম সুযোগ লাভ করেছিলেন। মহারাজা কলেজে তাঁর পাঠদান কক্ষগুলো ছাত্রদের ভীড়ে ঠাসা থাকত। তিনি শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পূর্ব হতেই সেখানে বিরাজ করত এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ। রাধাকৃষ্ণানের প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা যেমন বিগলিত হয়ে উঠতেন তেমনি হয়ে উঠতেন আত্মস্থ। এই কলেজের এক বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ভি. সীতারামাইয়া। পরবর্তীতে তিনি এক গ্রন্থ লিখেছিলেন 'My Collage Days' রাধাকৃষ্ণানের অধ্যাপনার বিবরণে তিনি বলেছেন, "তাঁর পড়ানোর বিষয়গুলো ছিল এত বিশাল আকারে বিস্তৃত যে বিষয়বস্তুর কোনো অংশই বাদ পড়তো না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও স্টাইলে উপস্থাপন করতেন। তাঁর শিক্ষাদানে এমন পূর্ণতা ছিল যে ছাত্রদের কোনো বিষয় বাইরে থেকে পড়তে হোত না। বই না পড়েই, তাঁর শ্রেণীকক্ষের বিষয়বস্তু শুনেই পরীক্ষায় ভাল ফল করা যেত।" প্রীতিমুগ্ধ সীতারামাইয়া বলেছেন, "His teaching was so exhaustive and nothing relevant to a topic or discussion was left out that one could even pass higher examination by simpley listening to whatever he said or read whatever was dictated. That clarity of thought, flourish of language and judgment regarding issues was all his. They were final same times we felt should he not leave some thing to us for our study ! Such was the completeness of his treatment of a subject or topic."

ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা একজন শিক্ষকের ঈশ্বরীয় গুণ। এই গুণ রাধাকৃষ্ণানের ছিল। কলেজের শেষে সন্ধেবেলায় ছাত্রদের ডাকতেন তাঁর বাড়িতে। শিক্ষাদানের বিষয়বস্তুর সম্যক আলোচনা ও বিষয়বস্তুকে জীবনের সঙ্গে আত্তীকরণের এক মহৎ প্রচেষ্টা তাঁর এই পাঠচক্রগুলোতে পূর্ণতা পেত। তিনি গৃহশিক্ষকতা করতেন না। অর্থের কোনো সম্পর্ক ছিল না ছাত্রদের সঙ্গে। ওই সব ছাত্রছাত্রীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে জলখাবার কখনও বা চা বিস্কুট দ্বারা আপ্যায়িত হতেন। সকল ছাত্রেরা রাধাকৃষ্ণানকে তাঁদের স্বাভাবিক বন্ধু ও হৃদয়ের গুরুদেব বলে মনে করতেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র পোথান জোসেফ তো তাঁকে বলতেন 'Students Prince'— ছাত্রদের রাজকুমার।

তিনি কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম ও ডাকনাম জানতেন। অনেক সময় ডাকনাম বেশি ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক ছাত্রকে পিঠে হাত দিয়ে কাছে ডেকে নিতেন। মহারাজা কলেজের অলিন্দে অলিন্দে এটা এক স্বাভাবিক দৃশ্য ছিল যে অসংখ্য ছাত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাধাকৃষ্ণান হেঁটে চলেছেন। তাঁর সংস্পর্শে আসা তাঁর শ্রেণীকক্ষের ছাত্রদের তিনি কখনও ভোলেননি। যে ছাত্ররা তাঁর আত্মার গর্ভ হতে জাত।— "আচার্য উপনয়নমানো শিক্ষার্থীন : কৃনুতে গর্ভমানতহঃ"--- সেই ছাত্রদের তিনি ভুলবেন কী করে?

তাঁর আরেক প্রিয় ছাত্র ছিলেন এস. নিজলিঙ্গাপ্পা। নিজলিঙ্গাপ্পা তাঁর ভালোবাসার আস্বাদ পেয়েছিলেন। তাই 'Students Idol' প্রবন্ধে তিনি অর্ঘ প্রদান করে বলেছেন, "Even today whenever he sees his students, he pats them affectionately on the back, calls them by nick name and it is a wonder how he remembers quite large number of them even after a lapse of about 40 years."

এই গুণ মনুষ্যজাত হয়তো বা নয়। এই প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের পিছনে আছে এক পরম ঐক্যবোধ। এই ঐক্যবোধ ছাত্র-শিক্ষকের জীবনে আরাধনার বস্তু। যাঁদের আছে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে পূর্ণতার দিকে যাত্রা করেন। যাঁদের নাই তাঁরা বিস্মৃতির এক ঘন অন্ধকার হারিয়ে যান।

হঠাৎ রাধাকৃষ্ণান সুযোগ পেয়ে গেলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্যার আশুতোষ মুখার্জী রাধকৃষ্ণানকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন। মহীশূরের মহারাজা কলেজ ছেড়ে তিনি চলে যাচ্ছেন এই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। মহীশূর শহরের ছাত্র, অধ্যাপক, সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়ালেন--- 'যেতে নাহি দিব'। তাঁর পদত্যাগের খবরে শিক্ষক-ছাত্র, অভিভাবক সকলেই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর বেতন বাড়ানোর দাবি জানাতে লাগলেন। বিস্মিত, বিমূঢ় রাধাকৃষ্ণান তাঁদের প্রেমের এই পরিণতিতে হতবাক হয়ে গেলেন। মহীশূরের ছাত্রসমাজ কোনোদিনই এই উন্মত্ত আচরণের পরিচয় দেয়নি। রাধাকৃষ্ণানের সান্নিধ্যে সব শান্ত হয়ে এল। যেদিন তিনি ট্রেনে করে কলকাতায় যাবেন সেদিন ছাত্ররা একটি ঘোড়ার গাড়িকে ফুল দিয়ে সাজালেন। তার মধ্যে তাঁরা বসালেন রাধাকৃষ্ণানকে। মহারাজা কলেজ থেকে স্টেশন ছিল পাঁচ মাইলের পথ। এই দীর্ঘপথ ধরে ছাত্র অভিভাবকেরা তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে চললেন। গাড়ি থেকে ঘোড়া আগেই খুলে নেওয়া হয়েছিল। এই দীর্ঘপথ ধরে বিষণ্ণ জনতা ছিল রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গী। রাধাকৃষ্ণান যখন মহারাজা কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। পৃথিবীর ইতিহাসে শিক্ষক জীবনের এই ধরণের ঘটনা আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

তাঁর প্রিয় ছাত্র এম. যমুনাচার্যের ভাষাতেই সেদিনের চিত্রটা তুলে ধরতে ইচ্ছে করে, ‘‘The train was about to steam off, the beloved teacher stood at the door of the compartment. We were all in tears. The great professor wept too. It was a sweet and sad parting. He held out his hand to bless us. We were grateful for his grace. Our eyes were wet and throats were parched. We could hardly summon up, the capacity to cry full throated Radhakrishnan Ki Jai, which however we did. So he was borne away by the train and he was out of sight, leaving behind a trail of glory and the gleam of a sweet vision which is an abiding possession with us.’’ ট্রেন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্ম। যেন নিভে গেছে সব।

আমার বলা এই কাহিনিগুলো যেন কল্পলোকের রূপকথা বলে মনে হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণানের জীবন রূপকথার ছিল না, এ ছিল পরম করুণাময় ও মনুষ্যজীবনের রূপময়তার কথা। এ জীবন শিক্ষক সমাজের আদর্শ জীবনদর্শন।

আজকালের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা বিচিত্র দ্বন্দ্ব দেখা যায়। শিক্ষক যখন প্রশাসক হন তখন তিনি যেন ছাত্রসমাজের কাছে থেকে দূরে সরে যান। তাই আজকাল অধিকাংশ প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা, অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষা, কুলপতি বা উপাচার্যরা ক্লাস নেন না। তাঁদের প্রশাসনিক কাজকর্মের দোহাই দেন এবং কালক্রমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে তাঁরা দূরে সরে যান। প্রধান শিক্ষক হোন বা অধ্যক্ষ হোন কিংবা উপাচার্য হোন— তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি শিক্ষক। অথচ তিনি যদি শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার সময় না পান বা মানসিকতার অভাব ঘটে থাকে— তবে বুঝতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কফিনে পেরেক পুঁততে চলেছে।

রাধাকৃষ্ণান অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর রূপে যোগ দিলেন ১৯৩৪-এর ১ মে। তখন তাঁর ৪৬ বছর বয়স।

ড. রাধাকৃষ্ণানের স্মরণে ডাকটিকিট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সময় চরম দারিদ্র্য। ঘর নেই, হস্টেল নামমাত্র। বিভিন্ন বিষয় অনুপস্থিত। তিনি আশুতোষ মুখার্জীকে অনুসরণ করলেন। অধ্যাপনার ক্ষেত্রকে বিশাল করার জন্য বহু খ্যাতনামা অধ্যাপকদের নিয়ে এলেন। ল্যাড উইগ উল্ফ, স্যার জে. সি. কয়াজি, ভি. কে. আর. ডি. রাও, হীরেন মুখার্জী, শৈলেশ্বর সেন, হুমায়ুন কবীর, টি. আর. শেষাদ্রি, ভাগবন্তম, কে. আর. রামারাও, এম. ভেঙ্কটরঙ্গৈয়া, ভি. এস. কৃষ্ণ, পি. টি. বাজুর মতো বিখ্যাত অধ্যাপকদের নিয়ে এসেছিলেন প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। তাঁদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের অপূর্ব সম্পর্ক ছিল। তাঁকে তাঁরা পরিবারের প্রধান বলে মনে করতেন। ১৯৩১-৩৫-এ ভারতীয় রাজনীতিতে ভয়ঙ্কর আন্দোলন চলছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নমতের আন্দোলনও ছিল। কিন্তু রাধাকৃষ্ণান চিরদিনই বহুত্ববাদকে স্বীকার করতেন। তাই তাঁর আত্মীয় পরশে বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্দিক পরিবেশ ছিল।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতেন, বিখ্যাত অধ্যাপকেরা তাঁর পাঠদানের কৌশল শোনার জন্য উঁকিঝুঁকি মারতেন। তাঁদের এই আগ্রহে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না, কিন্তু ছাত্রদের মনোযোগ ব্যাহত হোত বলে রাধাকৃষ্ণান অধ্যাপকদের এই আচরণ হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন।

অনেক সময় তিনি ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন। কোনো কক্ষের জানালা ছিটকিনির জন্য বন্ধ থাকলে ছাত্রদের কষ্টের সমভাগী হয়ে মুহূর্তে মিস্ত্রী ডাকিয়ে জানালা মেরামত করতেন।

তিনি জানতেন, একটি গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদয়। রক্ত সঞ্চালন শক্তির মতো গ্রন্থাগারের কাজ ছিল জ্ঞানশক্তি সঞ্চালনের। কী অপূর্ব নিষ্ঠায় তিনি গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন।

অনুশাসনে তিনি বজ্রকঠোর ছিলেন। একবার তিনি বিজ্ঞান কলেজ পরিদর্শনের সময় দেখলেন একটি শ্রেণীকক্ষে ছাত্ররা বসে আছে। ঘরে কোনো অধ্যাপক নেই। রাধাকৃষ্ণান কক্ষে প্রবেশ করলেন, দেখলেন ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে— ‘‘মি. গোবিন্দ কৃষ্ণাইয়া বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ আছেন, ক্লাস হয় না।’’ রাধাকৃষ্ণান জানলেন তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস নেন না। পরে সেই অধ্যাপককে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘‘কতদিন ধরে কত ছাত্রের ক্ষতি করেছেন আপনি! এই ক্ষতি আপনাকে পূর্ণ করতে হবে।’’ কৃষ্ণাইয়া ভালো করে জানতেন রাধাকৃষ্ণানকে। ক্ষতি পূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি পদত্যাগ করে বার্মাসেলের তেলের কোম্পানিতে যোগ দিলেন। এই ছিলেন রাধাকৃষ্ণান। ছাত্রদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সহ্য করতে পারতেন না। এখন ভারতবর্ষে আদর্শ ও নিষ্ঠাহীনতায় ধূসর মরুভূমিতে রাধাকৃষ্ণানের অভাব গভীর ভাবে উপলব্ধি করি।

একদিন রাধাকৃষ্ণান জানতে পারলেন ছাত্র-ছাত্রীরা টি. আর. শেষাদ্রির ক্লাস বয়কট করছেন। শেষাদ্রির মতো প্রতিভাবান অধ্যাপকের ক্লাস বর্জন? তিনি জানতে পারলেন ছাত্রদের সংযুক্ত করা হয়েছে স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের আন্দোলনে। শেষাদ্রি তামিলিয়ান তাই তাঁর ক্লাস বয়কট! শুনেই ঝলসে উঠলেন রাধাকৃষ্ণান। যাঁর হার্দিক প্রচেষ্টায় অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে হিন্দু, মুসলমান ছাত্রদের পৃথকভাবে রান্না বন্ধ করে এক সঙ্গে রান্না হচ্ছে এবং রাধাকৃষ্ণান ছাত্রদের সঙ্গে মেঝেতে বসে এক সঙ্গে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে আসার সময় হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংবর্ধনায় ড. রাধাকৃষ্ণান।

আহার করেছেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা? মুক্ত ও পূর্ণাত্মার পূজারি ছিলেন রাধাকৃষ্ণান। তিনি ছাত্রদের ডেকে বললেন, 'শেষাদ্রি কি পড়াতে অক্ষম?' ছাত্রেরা মাথা নীচু করলেন। তিনি তখন ঘোষণা করলেন, ''শেষাদ্রিকে যদি বয়কট করা হয় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবেন। মুহূর্তের মধ্যেই তখন অজানা আশঙ্কাজনিত ভীতির হিমশীতল পরশ বয়ে গেল ছাত্রদের মধ্যে। সকলে এসে চরণে প্রণিপাত করে বলে উঠল, ''স্যার ক্ষমা করুন।''

আজ রাধাকৃষ্ণান নেই। কিন্তু তাঁর শিক্ষকতার আদর্শ চির দীপ্যমান। জীবনের বিভিন্ন স্তরে তিনি গিয়েছেন— রাষ্ট্রদূত থেকে রাষ্ট্রপতি— কিন্তু তাঁর সবচাইতে বড়ো পরিচয় তিনি শিক্ষক। তাই সান্ধ্য মুহূর্তে যখন রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ছাত্রদের কাঁধে হাত দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের দ্বার অবধি তাঁর প্রাণের ছাত্রদের এগিয়ে দিতে আসতেন— তখন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন, ''স্যার, আপনি কোনো রাষ্ট্র প্রধানকেও দেশের প্রোটোকল অনুসারে দ্বার অবধি এগিয়ে দিতে পারেন না— এরা তো আপনার ছাত্র?''

রাধাকৃষ্ণান স্মিত হেসে প্রত্যুত্তর করতেন, ''ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বের কোনো কূটনীতির প্রাচীর নির্মাতা এখনও জন্মগ্রহণ করেননি।''

ভারতবর্ষে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের মূল্যবোধটাই হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত শিক্ষক যেমন ছাত্র তৈরি করেন তেমনি ভাবে তৈরি করেন সমাজ। আমি জানি— একটি শিক্ষক, শিক্ষিকা বা অধ্যাপক অধ্যাপিকার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কীভাবে শিক্ষালয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। আজকের বস্তুতান্ত্রিক, ভোগবাদীতে আদর্শহীন সমাজকে গঠন করা কী ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক কাজ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকার কাছে--- এ বাস্তববোধ আমারও আছে। কারণ শিক্ষক, সমাজ ধাবমান মশাল বহনকারীর দলই শুধু নন--- তাঁরাই ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরসূরি। তাই এই কঠোর কাজের চ্যালেঞ্জ তাঁরাই গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে তাই রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

চিঠিপত্র

নাম বদলে অনাচার কমবে কি?

পশ্চিমবঙ্গের নাম যাই হোক না কেন তাতে কি ধর্ষণ, সিন্ডিকেটরাজ ও তোলাবাজি রোখা যাবে? কারণ পশ্চিমবঙ্গের শাসকগণের ক্ষমতা নেই এই বিশাল সংখ্যক বেকারদের জীবিকা নির্বাহের সুষ্ঠু ও আইনগত কোনো ব্যবস্থা করে দেওয়ার। তাই তাদের দলে রেখে ভোটের সময় যাতে বিপক্ষ ভোট দিতে না পারে তার জন্য গুণ্ডাবাজি সিন্ডিকেটবাজি ও তোলাবাজি করার অলিখিত অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। বিগত পাঁচ বছরে এতে তারা অভ্যস্ত। বাড়ি-গাড়ি বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। তাদের আজ ধড়পাকড়?

শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ও যৌননিগ্রহ এরাজ্যে যেভাবে বেড়ে চলেছে রাজ্যের নাম পরিবর্তন করলে কি এগুলি কমবে? মনে হয় না। গৃহশিক্ষক ধর্ষণ করছে, কন্যাযাত্রী আসা মেয়েদের ধর্ষণ করছে, গাড়ি থামিয়ে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করছে, ক্যাডারদের মর্জিমতন না চললে বাড়িশুদ্ধ সকলকে ধর্ষণ করার হুমকি দিচ্ছে, রোজ সংবাদপত্রে শুধু ধর্ষণ। ধর্ষণের খবর পড়ে সকলেই আতঙ্কিত যে এই রাজ্যে কাল কার পালা পড়বে।

পার্ক স্ট্রিটে জীবিকার জন্য যারা 'বারে' গিয়ে দর্শক মনোরঞ্জন করে, তাদের মধ্যে একজনকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে ধর্ষণ করা হয়। তদন্তে তাদের মধ্যে ধরা পড়াদের তৃণমূলি বলে চিহ্নিত হলে আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বেমালুম অস্বীকার করে দিলেন। আবার আই পি এস দময়ন্তী সেন সত্য উদঘাটন করার পর রাগে মুখ্যমন্ত্রী দময়ন্তী সেনের পদাবনতি ঘটিয়ে দিলেন। অর্থাৎ অনুগতরা, অনুগৃহীতরা ধর্ষণ করে ধরা পড়লে (বেশিরভাগ সংখ্যালঘু) তাদের শাস্তি যাতে না হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান।

কোথায় যাবেন বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে? কোথাও গিয়ে শান্তি নেই মহিলাদের। তিন থেকে তিরাশি কেউ বাদ যায় না। একবার ইউনিসেফের গাড়িতে অনিতা দেওয়ানকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। যারা করেছিল তারা ছিল বাম সমর্থক। সেই শুনে প্রয়াত জ্যোতিবসু বলেছিলেন, এমনটা তো হতেই পারে। ধর্ষণকারীদের একমাত্র শাস্তি 'লিঙ্গছেদন'। হলফ করে বলতে চাই ওই শাস্তি দশজনকে দিলে ধর্ষণ কমবেই কমবে।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

অপরাধ প্রবণতা ও শাস্তি

দস্তুর মতো ভুল কাজ করব, জেনে শুনে নিজের এবং সমাজের বিপদ ডেকে আনব। আর শোধরাবার কথা যে বলবে তাকে ফটোফ্রেম বানিয়ে দেব। আজ পশ্চিমবঙ্গে এটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যার ভয়াবহতার প্রভাব সমগ্র রাজ্যবাসীর মনের ওপর পড়েছে— বিপদ এলে পালিয়ে যাও। কারণ অন্যায় বা বিপদ সৃষ্টিকারীদের ভয়ে সমগ্র সমাজজীবন আজ বিধ্বস্ত। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় এই অন্যায়কারীদের পিছনে কারুর না কারুর হাত রয়েছে এবং সেই অদৃশ্য হাতের বরাভয়ে অন্যায় দিনের পর দিন বেড়ে চলে। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে কিছু মানুষ জেনে বা না জেনে ভুল করে, তাদেরকেও কিছু বলা যায় না। যেমন, প্রকাশ্যে ধুমপান, খইনি, গুটখার মতো নেশার বস্তু ব্যবহার করে একশ্রেণীর লোক। তারও প্রতিবাদ করা যায় না, কারণ অন্যায়কারীরা সঙ্ঘবদ্ধ। তাই সমাজ জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য বিদেশের উন্নত দেশগুলিতে অন্যায়কারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান রেখে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে পরিচালনা করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সে ব্যবস্থা আজও নেই। তাই অন্যায়কারীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। আর প্রতিবাদীর সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। আত্মসর্বস্ব স্বার্থপররা অন্যের বিপদকে যতদিন না নিজের বিপদ বলে ভাববে ততদিন এ দুর্দশা চলতে থাকবে। সম্প্রতি দেশের সড়ক পরিবহণ বিভাগ মোটর ভেহিকলস চালক ও তার মালিকদের ক্রমবর্ধমান অপরাধ লক্ষ্য করে এবং দৈনন্দিন সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঠেকাতে অপরাধকারীদের শাস্তি স্বরূপ জরিমানার পরিমাণ বাড়িয়েছে। সভ্য সমাজের এগিয়ে এসে অপরাধকারীদের অপরাধের বিরোধিতা করে ব্যক্তিগত লাভ এবং সমাজের জাগরণ ঘটানো একান্ত দরকার। যদি তা না হয় নিজের ক্লীবতায় নিজেরই মৃত্যু ঘটবে, অন্যকে দোষারোপ তখন মূর্খামি।

—**এম এম সিংহ,**
বাগবাজার, কলকাতা।

বাচ্চা ইলিশ বেচা-কেনা

প্রতিদিন রেডিও-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে শুনছি ও দেখছি ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশ মাছ ধরা ও বেচা-কেনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর রোজই দেখছি বাজারে এই শাস্তিযোগ্য কম্মটি অবাধে চলছে। কে না জানে বিভিন্ন ফলে বিষাক্ত কারবাইড, শাকসবজিতে নিষিদ্ধ রং, মাছে স্বাস্থ্যহানিকর রাসায়নিক ফরমালিগ প্রয়োগ ইত্যাদি আইনবিরোধী কাজগুলি অবাধে করা হচ্ছে। তাহলে এতদ্‌সংক্রান্ত আইনসমূহ কি প্রহসন হয়ে যাচ্ছে না? সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কী করছেন বোঝা দায়! আমরা বড়ই অসহায়।

—**কমলাকান্ত বণিক,**
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

পদমর্যাদার অপব্যবহার

ইংরেজি Discipline (অনুশাসন) শব্দটির বাংলা হলো নিয়ম। আজ বহু জায়গায় নিয়মের নামে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। এক কথায় জোর যার মুলুক তার, এরকম ব্যাপার। আরও একটু সহজভাবে বললে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা

তদপেক্ষা নিম্ন বা অধস্তনদের উপর ছড়ি ঘোরানোর মতো। এই ঘটনা আজ যে সমস্ত পরিবারে ঘটে সেই পরিবার ভেঙে খান খান হয়। যদি কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনে ঘটে তাতে একে অপরের মিত্রের জায়গায় শত্রু হয় এবং সেই সংগঠন ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিশেষ করে পদমর্যাদা প্রাপ্ত আনন্দে মশগুল হয়ে অনেক সময় হিতাহিত জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নেয় যা বড় বড় অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনে আজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। বহু ক্ষেত্রে দেখেছি কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি পদমর্যাদাযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণকারী তোষামুদি কাজ করলে, পদমর্যাদাযুক্ত ব্যক্তি তার প্রতি খুশি হন এবং তোষামোদকারী তার ফলটি তুলতে পারে। তাই নিয়মের ব্যবহার সম্বন্ধে উর্ধ্বতনদের সতর্ক থাকা উচিত। অধস্তনদের সর্বদা আপন পরিবারের সদস্য রূপে বিচার করা উচিত। যেটি পদমর্যাদা প্রাপকদের করা উচিত তাহলো অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করা এবং তিনি আজীবন ওই দায়িত্বে থাকবেন না এটি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা।

—**আয়েষা খাতুন,**
ডুমুরজলা, হাওড়া।

হিন্দুত্ব

রবীন সেনগুপ্ত তাঁর নিবন্ধে (১৫.২.১৬) বলেছেন, হিন্দুত্ব হলো— এক জীবন পদ্ধতি। কিন্তু 'হিন্দুত্ব' কথাটির তাৎপর্য, সম্ভবত, অত সীমিত নয়। এ প্রসঙ্গে, বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের 'Hindutva' পুস্তকটি স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে তিনি বলেছেন, হিন্দুত্ব এবং হিন্দুধর্ম বা হিন্দুয়ানি সমার্থক নয় ('Hindutva is ditterent from Hinduism.')। সবিস্তারে ইতিহাস পর্যালোচনা করে সাভারকর বলেছেন— এক রাষ্ট্র, এক জাতি এবং এক সভ্যতা (সংস্কৃতি), এই তিনটি হলো— 'the essentials of Hindutva'।

১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ তাঁদের রায় এই মত ব্যক্ত করেন যে, হিন্দু শব্দের দ্বারা ইসলাম বা খৃস্টধর্মের মতো কোনো বিশেষ ধর্মকে বোঝায় না। হিন্দু শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক এবং প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের দ্বারা একটি বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতি, যা বিগত হাজার হাজার বছর ধরে এই ভারতবর্ষে চলে আসছে তাকেই বোঝায়। কাজেই হিন্দুত্বের কথা বলে ভোট চাওয়া কোনো মতেই সাম্প্রদায়িক কাজ নয়। উল্লেখ্য, ৩ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত উক্ত বেঞ্চের অন্যতম সদস্য ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং তিনি ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত--- ('ইসলামি ধর্মতত্ত্ব'— ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী পৃ. ১৭৬)।

রবীনবাবু বলেছেন, ব্যাপটাইজ ও সুন্নতের মাধ্যমে মানুষকে খৃস্টান ও মুসলমান করে ভুল যুক্তি তথ্যের মাধ্যমে তাদের 'নাস্তিক' করে তোলা হয়। অদ্ভুত কথা! খৃস্টধর্ম বা ইসলাম তো নিরীশ্বরবাদী নয়। খৃস্টানদের ঈশ্বরের ইংরেজি নাম 'গড্', মুসলমানদের ঈশ্বরের আরবি নাম 'আল্লাহ'।

রবীনবাবু যে সুন্নতের কথা বলেছেন, ইহুদিদের ঈশ্বর জিহোবা-র সঙ্গে বাইবেলের আব্রাহাম-এর মধ্যে এক চুক্তির (covenant) মাধ্যমে ওই প্রথার সূচনা— (জেনিসিস- ১৭.৯)। মদিনা বাসকালে হজরত মহম্মদ মুসলমানদের মধ্যে ওই প্রথার সূচনা করেন।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

আরব আক্রমণে পারসিকরা দেশছাড়া

প্রথমেই সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই সন্দীপ চক্রবর্তীর 'ভারতের বহিরাগত আত্মীয়' নিবন্ধটি প্রকাশের জন্য। আমরা পারসিক জাতি সম্বন্ধে খুব বেশি জানি না। সন্দীপবাবুর লেখায় অনেক কিছু জানা সম্ভব হলো। কিন্তু সন্দীপবাবু যা লিখলেন না তা হলো কেন পারস্য থেকে পারসিক জাতি তাঁদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো এবং শরণার্থী হয়ে নবম শতাব্দীতে ভারতে এল। T.H.B. Dhalla, 'Coutra Conversion, The case of Zoroastrian in India' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, নবম শতাব্দীতে পারস্যে আরব আক্রমণের পর অত্যাচারে পারসিক জাতি ছন্নছাড়া হয়— না থাকে তাদের নিজেদের বাসভূমি, না রাষ্ট্র। এই জাতি প্রাচীন কাল থেকেই সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চ স্থানে পৌঁছেছিল। তাঁদের ছিল একটি নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, কবিতা, উৎসব, খাদ্য ও রঙ্গরসিকতা। কিন্তু তারা আরব আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। দেশ বিদেশি অধিকৃত হওয়ার পর পারসিকরা জাতিসত্তা রক্ষার জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মতোই অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয় জন্মভূমি পারস্যের মায়া ত্যাগ করে। যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসেন হিন্দু রাজা যাদব রাজা তাঁদের আশ্রয় দেন। কিন্তু যাঁরা চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয়েছে ('totally wiped out') সম্ভবত চীনাদের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাহ প্রক্রিয়ার দ্বারা। ভারতে যে পারসিকরা এসেছিলেন তাঁরাই তাঁদের হাজার বছরের জাতিসত্তা আজও রক্ষা করে ভারতে আছেন। যারা চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের জাতিসত্তা যেমন বিলুপ্ত করা হয়েছে তেমনি যারা পারস্যেই থাকতে বাধ্য হয়েছিল তাঁদের জাতিসত্তাও আজ আর নেই। ২০১২ সালের হিসেবে প্রাচীন পারসিকদের শতকরা ৯৮ শতাংশ পারসিক জাতির জনসাধারণকেই পারস্যে মুসলমান করা হয়ে গেছে (Wikipedia Free Egydogedia 2012) যদিও অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১০ শতাংশ ছিলেন মুসলমান।

আজ যারা গেরুয়া অসহিষ্ণুতার জিগির তুলছে তা যে এক রাজনৈতিক সেমেটিক রণকৌশল তা ভারতবাসীদের বুঝতে হবে। অসহিষ্ণু কে? যারা পারস্যের পারসিক জাতির জাতিসত্তা বিনাশ করেছে তারা, না যে হিন্দু ভারতবাসী পারসিকদের জাতিসত্তাকে রক্ষা করেছেন, সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন তাঁরা?

—**সন্দীপন চক্রবর্তী,**
দমদম-৫৫।

কৃষক-দেবতা ভগবান বলরাম

অজিত বারিক

কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে কৃষকরা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও কোনো কৃষক দিবস পালিত হয় না। কৃষকরা নিজেরাও পালন করে না। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ভাদ্রশুক্লা ষষ্ঠী তিথি ভগবান বলরামের জন্ম দিনটি কৃষক দিবস রূপে পালন করে চলেছে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাগণ ভগবান বলরামের জীবন চরিত গভীরভাবে অধ্যয়ন ও বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর জন্মদিনকে কৃষক দিবস রূপে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ বছর ২১ ভাদ্র শুক্লা ষষ্ঠী তিথি ভগবান বলরামের জন্মদিন। দিনটি কৃষক দিবস রূপে সারা দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পালিত হবে। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের সদস্যরা গ্রামের জনগণের সঙ্গে বৃক্ষরোপণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে সংকল্প করেছে। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ দেশের একটি অরাজনৈতিক ও সর্ববৃহৎ কৃষক সংগঠন।

প্রাচীনকালে মথুরা নগর ছিল যদুবংশীয় রাজাদের রাজধানী। দ্বাপর যুগে সুরসেনের পুত্র উগ্রসেন সেখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর ভাই দেবকের কন্যা দেবকীর বিবাহ বসুদেবের সঙ্গে হয়। উগ্রসেনের পুত্র কংস দৈববাণী শুনে জানতে পারে যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তার মৃত্যুর কারণ হবে। কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্দি করে রাখে। পিতা উগ্রসেনকেও কারাগারে নিক্ষেপ করে কংস নিজে রাজা হয়ে বসেন। এক এক করে দেবকীর ছয় সন্তানকে হত্যা করেন তিনি। জনসাধারণের উপর দমনপীড়ন বাড়তে থাকে। লোকেরা গ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালাতে থাকে। দুষ্ট লোকদের প্রশ্রয় দিয়ে নিজের কাজের অনুগত করে নেয়। দেশের নিরীহ কৃষকদের উপরও অত্যাচার করতে থাকে তারা। কংসের অনুচরেরা কৃষকদের ফসল জোর করে কেড়ে নিত। অন্যায় করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কৃষকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। তার আদেশ অমান্য করার উপায় ছিল না, করলে নির্মম দণ্ড ভোগ করতে হোত কৃষকদের। কংসের অনুচরদের মধ্যে কেশি, প্রলম্ব, ধেনুক পুতনা প্রমু্খ প্রজাদের নৃশংসভাবে হত্যা করত। সমস্ত জনপদ উজাড় হয়ে যায়। চাষবাস পশুপালন সবই বন্ধ হয়ে যায়। বেকার ও অনাহারী মানুষের সংখ্যা ব্যাপক বাড়তে থাকে। সারাদেশে হাহাকার পড়ে যায়। এই দুঃসময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের আবির্ভাব ঘটে ভারতভূমে।

দেবকীর সপ্তম গর্ভে ভগবান বলরামের জন্ম। কঠোর প্রহরা থাকা সত্ত্বেও একদিন লোকেরা জানতে পারল যে দেবকীর গর্ভ উধাও হয়ে গেছে। বাস্তবে যোগমায়া কর্তৃক দেবকীর গর্ভস্থ শিশুকে বসুদেবের প্রথমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বসুদেব কারাগারে থাকার কারণে গোকুলে নন্দরাজার ঘরে রোহিণী সুরক্ষিত ছিলেন। এই ঘটনার পাঁচদিন বাদে রোহিণীদেবী শুভ ভাদ্রপদ শুক্লপক্ষ ষষ্ঠীর দিন দুপুর বারোটার সময় অভিজিৎ মুহূর্তে তুলালগ্নে ভগবান বলরামের জন্ম দেন। সেদিন বুধবার স্বাতী নক্ষত্র ছিল। নবজাতকের প্রভাবে নন্দগৃহ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মেঘ থেকে বৃষ্টি হতে থাকে। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন। সারা ব্রজমণ্ডল আনন্দে মেতে ওঠে। ভগবান বলরামের জন্মের এগারো মাস সতের দিন পরে ভাদ্র পদ কৃষ্ণ নক্ষত্র অষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে।

দুষ্ট কংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গোপনে গোকুলে মিত্র নন্দ রাজার ঘরে বসুদেব কৃষ্ণকে রেখে আসেন। সেখানে নন্দ রাজা ও যশোদার পুত্ররূপে পালিত হতে থাকে দুই ভাই।

কৃষ্ণ বলরামের বাল্যকালে খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপ করে অত্যন্ত দুরন্তপনার মধ্যে কাটে। দুই ভাইয়ের জন্মবৃত্তান্ত ছিল অলৌকিক ও বিস্ময়কর। দুই ভাইয়ের বাল্যলীলার ঘটনাগুলি সাধারণ লোকের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। লোকদের ধারণা এই বিস্ময়কর বালকদু'টি দৈবশক্তির অধিকারী। লোকের এই সন্দেহ যে অমূলক ছিল না তা বোঝা যায় কৃষ্ণ-বলরামের জীবনলীলা জানার পর।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন

তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য, দুষ্টদের বিনাশ ও শিষ্টজনদের পালনে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, পরেও হবেন। অন্য একটি মহান লক্ষ্যও তাঁদের ছিল। তা হলো দেশের বিধ্বস্ত কৃষির পুনর্স্থাপন করা। অথবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে কৃষির পুনর্স্থাপনই হলো ধর্মস্থাপনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আজকের সন্ত্রাসবাদীদের মতোই সে সময় সারাদেশে অসুর প্রবৃত্তির লোকদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাদের আসুরিক কার্যকলাপ দেশের জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ধনপ্রাণ কোনো কিছুরই নিরাপত্তা ছিল না। মথুরার রাজা কংস ও মগধ অধিপতি জরাসন্ধ ছিলেন দেশের অসুরদের নেতা। যে-কোনোভাবে দেশের মানুষদের আতঙ্কিত করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এমনকী আপনজনদেরও তারা হত্যা করতে দ্বিধা করত না।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম খেলার ছলেই অসুরদের অনেককেই মেরে ফেলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অনেক রথীমহারথী অসুর মারা পড়ে। বলরাম একাই অসুরকুলের বহু অসুরকে যমলোকে প্রেরণ করেন। কংস ও বাকিদের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিধন করেন। এইসব দুষ্ট অসুরেরা কেবল জনজীবনের উপর অত্যাচার করত না, দেশের কৃষিবিপণন, কৃষিসম্পদ ও কৃষি জমির উপরও অন্যায় অধিকার বলবৎ করে ক্ষতি সাধন করত। শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান বলরাম এদের সব অপচেষ্টা থেকে ভারতভূমিকে রক্ষা করেন।

ভগবান বলরাম রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। জনজাগরণ ও রাষ্ট্রনির্মাণের কাজকেই তিনি উচিত মনে করেন। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে জনসম্পর্ক অর্থাৎ সংগঠনের কাজকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ভগবান বলরামের এই অনুভূতিই ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ গ্রহণ করে অরাজনৈতিক ভাবে সংগঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ভগবান বলরাম বিধ্বস্ত কৃষিব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করার কাজ শুরু করেন। তিনি কৃষকদের দেবতা ছিলেন। আজকের তথাকথিত কৃষক নেতাদের মতো তিনি ছিলেন না। তিনি নিজে কৃষক ছিলেন। সেইজন্য তিনি কৃষি বিকাশের কাজকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কৃষকের প্রধান উপকরণ হলো লাঙ্গল ও মুশল— এই দুটিই ভগবানের দুই হাতে শস্ত্ররূপে সবসময় শোভা পেত। প্রয়োজনে তিনি এগুলি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে অসুর নিধন করতেন।

ভারতীয় কৃষির উন্নত পদ্ধতির বিকাশ ঘটান ভগবান বলরাম। নতুন ও উন্নত বীজ তৈরি করতে কৃষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন তিনি। তাঁর কৃষি পদ্ধতি ছিল নির্ভরযোগ্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল ও লাভকারী। তিনি একাধারে ভারতীয় পদ্ধতির কুশল শস্য বিজ্ঞানী, সেচ বিশেষজ্ঞ ও বীজ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বলদ সহযোগে চাষ, গোবরসার, গো-মূত্র উপযোগীরূপে ব্যবহার, জৈবিক চাষ, আত্মনির্ভর চাষ, সর্বপোষক চাষ, জৈবিকচক্র চাষ প্রভৃতির বিখ্যাত পদ্ধতিগুলির জনক ছিলেন। কৃষকের উৎপন্ন শস্য নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে কৃষক তা বীজরূপে সঞ্চয় করবে। এই ব্যবস্থাও তাঁর সৃষ্ট পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। ভগবান বলরামকে শেষাবতার বলা হয়। শেষ অর্থে অবশিষ্ট রাখো, সঞ্চয় কর, পরে তা খরচ করো। তিনি এ ভাবে সেবাকাজে সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তার কৃষিপদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ কম হোত বলে কৃষকের লাভ হোত বেশি। কৃষির উন্নতপদ্ধতি আবিষ্কার ও বিকাশের কারণে বলভদ্রের সহস্র নামের মধ্যে বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করা হয় :

জগৎমাতা, জগৎত্রাতা, জগৎভর্ত্তা জগৎপিতা।
জগদবন্ধু, জগৎধাতা, জগন্মিত্র, জগৎসখাঃ।।

তিনি কৃষকদের দেবতারূপে হলধর নামেও প্রসিদ্ধ।

(লেখক ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি)

SMALL INVESTMENT TO FULFILL OUR FINANCIAL GOALS......

SIP

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN IN EQUITY MUTUAL FUNDS

What is SIP?
Like a recurring deposit, Systematic Investment Plan Works on the Principle of regular investments, where you put aside a small amount every month. What's more, you have the opportunity to invest in a Mutual Fund by making small periodic investments in place of a huge one-time investment. In other words, **Systematic Investment Plan** has brought mutual fund within the reach of common man as it enables anyone to invest with a small amount on regular basis.

START EARLY + INVEST REGULARLY +
INVEST FOR LONG TERM = WEALTH CREATION

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

পরম্পরা

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম

অমিত ঘোষদস্তিদার

বালক সত্যকাম রোজ দেখে হরিদ্রুমান ঋষির পুত্র পূজনীয় গৌতম তাঁর আশ্রমে শিষ্যদের বিদ্যাশিক্ষাদান করেন। প্রতিদিন এমন নিষ্ঠাপূর্ণ বিদ্যাশিক্ষা দান এবং গ্রহণ দেখতে দেখতে সত্যকামের মনেও বিদ্যা শিক্ষার জন্য আকুল ইচ্ছা জেগে উঠল।

সত্যকাম পাঁচ বছর বয়সে মাকে প্রণাম করে মায়ের অনুমতি নিয়ে গৌতমমুনির আশ্রমে এল। মুনিকে প্রণাম করল। মুনি তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল তার নাম

সত্যকাম। তার মায়ের নাম জাবালা। সে গৌতমমুনির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চায়। মুনি যদি কৃপা করে তাকে শিষ্য করেন তবে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার ইচ্ছাপূরণ হবে। গৌতম মুনি সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করলেন তার পিতার নাম কী এবং তাঁর গোত্র কী। উত্তরে সত্যকাম জানাল সে তার পিতার নাম এবং গোত্র কিছুই জানে না। তার কথা শুনে গৌতম মুনির আশ্রমে যে শিষ্যরা ছিল তারা বিদ্রূপ করে উঠল। গৌতম মুনি শিষ্যদের তিরস্কার করে সত্যকামকে বলল সে যেন তাঁর মায়ের কাছে থেকে তাঁর পিতার নাম ও গোত্র জেনে আগামীকাল এসে জানায়। সত্যকাম গৌতম মুনিকে প্রণাম করে চলে গেল।

সত্যকাম গৌতম মুনির কাছ থেকে গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সে তার মাকে পিতার নাম এবং তাদের কী গোত্র জানাবার জন্য অনুরোধ করল। তার দীন-দুঃখী মা চোখের জলে ভেসে সত্যকামকে বুকে জড়িয়ে ধরে জানালেন যৌবনকালে অনেকের সেবাকার্য তিনি করেছেন। তাঁদের কেউ একজন তার পিতা। সেবাকার্যের জন্য তিনি সত্যকামকে পুত্ররূপে পেয়েছেন। পিতার নাম বা গোত্র তাঁর জানা নেই। সত্যকাম তাঁর পুত্র। তাই পৃথিবীতে তাঁর পুত্রের পরিচয় জাবালা সত্যকাম। পরের দিন সত্যকাম গৌতম মুনির আশ্রমে এলো। মুনিকে প্রণাম করে দাঁড়াল। উচ্চশিরে অকুতোভয়ে জানাল সে তার পিতার নাম বা গোত্র কিছু জানে না। তার মা তাকে যা জানিয়েছিলেন সত্যকাম দ্বিধাহীনভাবে গৌতমমুনিকে তাই নিবেদন করল। সত্যকামের সরলতা সততা সত্যভাষণে গৌতমমুনি আসন ছেড়ে তাকে আলিঙ্গন করে জানালেন সত্যকাম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। দ্বিজোত্তম। যে এইভাবে সত্যকে সম্মান দিয়ে উচ্চ আসনে বসাতে পারে সেই-ই নরোত্তম। তার মাতাও ধন্য। কেননা পুত্র বা মাতা জীবনের চরম প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। সত্যকে চির সম্বল করে জীবনের কঠিন প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়নি, সত্যই তার কাছে ঈশ্বর। গুরু গৌতম সত্যকামের উপনয়ন করালেন। ব্রহ্মচারী হলো সত্যকাম। তারপর রুগ্ন দুর্বল চারশো গোরু (মতান্তরে চারটি) গৌতম মুনি তাঁকে দিয়ে আদেশ করলেন এই দুর্বল গোরুগুলিকে নিয়ে সত্যকাম গভীর কোনো বনে গিয়ে এদের সেবা যত্ন করবে। গোরুগুলো যখন এক হাজার হবে তাদের নিয়ে সত্যকাম আবার গৌতম মুনির আশ্রমে ফিরবে। গুরু গৌতমকে প্রণাম করে সত্যকাম গোরুগুলিকে নিয়ে চলে গেল।

গভীর এক অরণ্যে সত্যকাম নিজের আশ্রম তৈরি করল। সে তার নিষ্ঠা, সেবা, সাধনাকে জাগ্রত করে তুলল। অরণ্যে থেকে প্রকৃতির শাশ্বত ভাষা শিখল। অক্ষরে অক্ষরে গুরুবাক্য পালনে তার কোনো ত্রুটিই ছিল না। দিনে দিনে গাভীগুলো হৃষ্টপুষ্ট হলো। সত্যকাম সংযত হৃদয়ে গুরুবাক্যে বিশ্বাস রেখে উপাসনা করে যেতে লাগল। একদিন সে দেখল গোরুগুলির সংখ্যা হয়েছে এক হাজার। এক হাজার গোরু নিয়ে সত্যকাম গৌতম মুনির আশ্রমে ফিরে এলো।

গুরু গৌতম সত্যকামের কর্তব্য কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে ঠিক করলেন তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করবেন। জ্ঞান পিপাসু সত্যকামকে গুরু গৌতম পরব্রহ্মের তত্ত্ব উজাড় করে বুঝিয়ে দিলেন। গুরু গৌতম জগতের অণু-পরমাণু থেকে বৃহৎ সৃষ্টির সর্বত্রই ব্রহ্মের উপস্থিতি— এই উপলব্ধি সত্যকামের মধ্যে জাগ্রত করালেন। সত্যকাম একজন মহান আচার্য ও ঋষি রূপে খ্যাত হলেন।

আচার্য সত্যকামের আশ্রমে নানা স্থান থেকে অনেক শিক্ষার্থী ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আসতেন। তিনি তাঁদের পরমব্রহ্ম সাধনায় প্রকৃত আচার্যের ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে 'উপাকোশলা' প্রায় ১২ বছর সত্যকামের কাছে ব্রহ্মচর্য পালন করে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সত্যকাম এবং ব্রহ্ম উপলব্ধি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে যে উপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা ছান্দোগ্য উপনিষদ (সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের এক অংশ)। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের মোট ১০টি অধ্যায়। এর শেষ ৮টি অধ্যায় নিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ। আত্মজ্ঞানলাভই হলো এই উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। ■

বেতাল পঞ্চবিংশতি থেকে

শব্দভেদী বাণের গল্প

চম্পা নগরে এক সময় চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানির নাম ছিল সুলোচনা আর রাজকন্যার নাম ছিল ত্রিভুবনসুন্দরী। রাজকন্যা বড় হলে রাজা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।

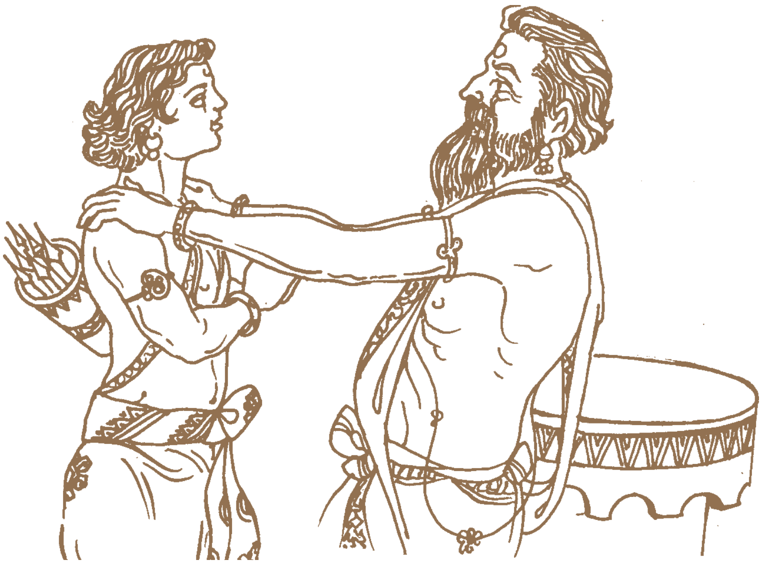

তাছাড়া ত্রিভুবনসুন্দরীর রূপ-গুণের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা দেশের রাজারা তাঁদের নিজেদের ছবি রাজার কাছে পাঠাতে লাগলেন। রাজা সেই সব ছবিগুলো রাজকন্যাকে দেখতে বললেন। কিন্তু রাজকন্যার একজনকেও পছন্দ হলো না।

রাজা চন্দ্রাপীড় কোনো উপায় না দেখে, স্বয়ংবর সভার কথা ভাবলেন। কিন্তু রাজকন্যা তাতে কিছুতেই রাজি হলো না। সে বলল, 'স্বয়ংবরের কোনো প্রয়োজন নেই। বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তিতে যে দক্ষ আমি তাকেই বিয়ে করব।'

বেশ কিছুদিন পর রাজকন্যাকে বিবাহ করার জন্য দূর দেশ থেকে চারজন যুবক রাজপুরীতে এল। রাজা ওদের নিজেদের গুণের পরিচয় দিতে বললেন।

প্রথম যুবকটি বলল, 'মহারাজ আমার বিশেষ গুণ হচ্ছে, আমি একদিনে একটা কারুকার্য করা কাপড় বুনে ফেলতে পারি। আর সেই কাপড়টা বিক্রি করে পাঁচটা রত্ন পাই। তার থেকে একটা রত্ন আমি ব্রাহ্মণকে দিই। একটা দেবতাকে দিই আর একটা নিজের গায়ে পড়ি, আর একটা যত্ন করে আমি তুলে রাখি। যে আমার স্ত্রী হবে সেটি আমি তাকে দেব। আর শেষ রত্নটি আমি খরচা করি। এই গুণ আর কারও আছে বলে আমার জানা নেই।

দ্বিতীয় যুবকটি বলল, 'মহারাজ আমি সমস্ত পশুপাখির ভাষা জানি, আমার মতো শক্তিশালী পুরুষ আর কে হতে পারে বলুন?'

তৃতীয় যুবকটি বলল, 'মহারাজ আমি হচ্ছি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আমার মতো পণ্ডিত আর কেউ নেই বলেই আমি জানি। আমি সমস্ত শাস্ত্র জানি।'

চতুর্থ যুবকটি বলল, 'মহারাজ আমিও শাস্ত্র জানি আবার আমার পিতা একজন রাজা, আর আমার একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে আমি শব্দভেদী বাণ মারতে পারি। এমন গুণের পুরুষ আর কে হতে পারে? আপনিই বলুন!'

এই চারজন যুবকের গুণের কথা শুনে রাজা চন্দ্রাপীড় খুব অবাক হয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন পাত্র হিসাবে চারজনই তাঁর মেয়ে ত্রিভুবনসুন্দরীর জন্য উপযুক্ত। এদের মধ্যে একজনকে বেছে রাজকন্যাকে বিয়ে দিতে হবে। রাজা নিজে মেয়েকে গিয়ে এই চার যুবককের গুণের কথা একে একে সব বললেন। সব কথা শুনে ত্রিভুবনসুন্দরী ভীষণ লজ্জা পেল, কোনো কথা বলল না।

এই গল্প শেষ করে বেতাল বলল, 'মহারাজ যুক্তি দিয়ে বলতো কে ত্রিভুবনসুন্দরীর স্বামী হওয়ার যোগ্য বলে তুমি মনে কর?'

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যে কাপড় তৈরি করে বিক্রি করে সে জাতে শূদ্র, আর যে পশুপাখির ভাষা জানে সে বৈশ্য, তৃতীয় জন শাস্ত্রজ্ঞ সে ব্রাহ্মণ, কিন্তু যে যুবকটি শব্দভেদী বাণ মারতে শিখেছে সে রাজার ছেলে। শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে বিচার করলে চতুর্থ যুবকটি রাজকন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র বলে আমার মনে হয়।'

ভারতের পথে পথে

অযোধ্যা

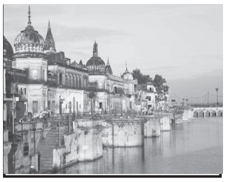

ভারতের একটি প্রাচীন জনপদ অযোধ্যা। সরযূ নদীর তীরের অবস্থিত এই শহর বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত। কথিত আছে, বহু বছর আগে মনু অযোধ্যা নগরী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে কোশল রাজবংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই অযোধ্যাতেই জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন ভারতের অন্যতম জনপদ হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে অযোধ্যায় বহু আক্রমণ হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাবরের আক্রমণ। বাবর অযোধ্যা আক্রমণ করে ভগবান রামচন্দ্রের জন্মভূমি দখল করে সেখানে তৈরি করে একটি মসজিদ। যেটিকে বাবরি মসজিদ বলা হতো। বর্তমানে সেই জন্মস্থান উদ্ধার হলেও এখনো কোনো মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়নি। ভারতীয়দের কাছে অযোধ্যা একটি তীর্থস্থান।

এসো সংস্কৃত শিখি

किमर्थ तद् न भवति ?

ওটা কেন হবে না?

नैव किल ?

না তো?

अहो। तथा किम्।

ও হো! এরকম ব্যাপার?

एवमपि अस्ति किम्।

এরকমও আছে কি?

अथ किम्।

আর কি?

ভালো কথা

কৃষ্ণ সাজো

গত জন্মাষ্টমীর দিন আমাদের এখানে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠান হয়। সারাদিন কীর্তন হয়, সন্ধ্যেবেলা হয় কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা। ছোটরা সবাই কৃষ্ণ সেজে আসে। মা আর আমি ভাইকে কৃষ্ণ সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবছর মোট ষাটজন কৃষ্ণ সেজে এসেছিল। হাঁটতে পারে না এমন বাচ্চাদেরও তাদের মায়েরা কৃষ্ণ সাজিয়ে এনেছিল। একজন দাদা সব কৃষ্ণকে একে একে নানা প্রশ্ন করে আর কৃষ্ণরা তার জবাব দেয়। শেষে সবাইকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

অনন্যা দাস, অষ্টম শ্রেণী, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) লে ম র শ্ব

(২) ন র অ বি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ল্পী আ ব রা

(২) নী রি ল গি

২২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) অপরাজিত (২) মধ্যপ্রদেশ

২২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) কমণ্ডলু (২) জরাসন্ধ

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯ (২) যাদব দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া (৩) সমন্বিতা সাহা, মঙ্গলবাড়ি, মালদা (৪) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

ঠাকুমা-দিদিমাদের রান্নার বৈশিষ্ট্য

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

আজকের দিনে আমরা খাবারের প্যাকেটের পুষ্টি সংক্রান্ত হিসেব- নিকেশ করে তবেই তা কিনি। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, আয়রন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট হলে তবেই তা আমাদের রান্নাঘরে ঢোকে। এত বিচার করে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া সত্ত্বেও আমরা দিনে-দিনে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমাদের ঠাকুমা- দিদিমাদের রান্নার স্বাদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল তার পুষ্টিমূল্য। টাট্‌কা মশলা পিশে রান্না করা হোতো, টাট্‌কা আটা মেখে রুটি বানানো আর টাট্‌কা দুধের বানানো মিষ্টি ছিল শুদ্ধ আর গুণে ভরপুর। খাবার সুস্বাদু বানানোর জন্য তাঁরা প্রতিটি ব্যঞ্জনে আলাদা অথচ গুণকারী মশলা ব্যবহার করতেন। আজ ব্যস্ততার কারণে আমরা বাজার চলতি মশলা রান্নায় ব্যবহার করি। এতে সময়ের হয়তো সাশ্রয় হয়, কিন্তু বিভিন্নরকম অসুখে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমরা তাঁদের কিছু রান্নার পদ্ধতি সম্বন্ধে সহজেই জানতে পারি।

ঠাকুমা-দিদিমাদের রান্নাঘরে কিছু বিশেষ নিয়ম পালন করা হোত, যার ফলে খাবারে স্বাদ আর পুষ্টিগুণ দুই-ই বজায় থাকত। আমাদের সুস্বাস্থ্যের সোনার চাবিকাঠি ছিল তাঁদের ওই রান্নাঘরে। পুষ্টিবিদ্ ডাঃ সন্ধ্যা পাণ্ডের মতে, আগেকার দিনে সবকিছু টাট্‌কা পাওয়া যেত। সেজন্য খাবারগুলি ছিল পুষ্টিকর। আজকাল আমরা রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিই, আর বার বার গরম করে খেতে থাকি। এতে রান্নার স্বাদ এবং পৌষ্টিকতা দুটোই কমে যায়। আগে টাট্‌কা খাবার খাওয়ার প্রচলন ছিল। বাসী খাবার বিশেষ খাওয়া হোতো না। খাবার বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতুর তৈরি বাসন ব্যবহার করা হোত, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। যেমন লোহার কড়াইতেই বেশিরভাগ রান্না হোত, ফলে রক্তাল্পতার মতো অসুখ অপেক্ষাকৃত কম হোত। তামার বাসনে জল খেলে দূষিত (বিষাক্ত) পদার্থ সহজেই শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায়। অড়হড় ডাল রান্নার সময় হিং, রসুন, আদা দিয়ে সাঁতলে নিলে ভাল হজম হয়

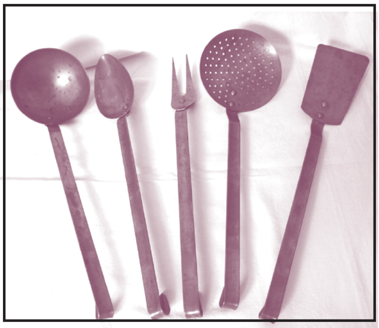

আর রান্নার স্বাদও বেড়ে যায়। আবার মুগ, মুসুর ডাল সুপাচ্য, সেজন্য পাতলা করে তা অসুস্থ ব্যক্তিকেও দেওয়া যায়। গরমে ছোট সহজপাচ্য মাছের ঝোল তো শীতকালে বড় মাছ আয়েস করে খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। ঋতু অনুসারে খাদ্যের গুণ ও স্বাদের বৈচিত্র্য হয় সেটা আমরা ভুলে গেলেও আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা তা জানতেন। তাঁদের হাতের লাউশাক, কুমড়োশাক, কচুরলতি, মোচা, থোড়, নানা সবজির খোসার চচ্চড়ির স্বাদ আমরা ভুলতে বসেছি। আমরা এখন বাজারে গিয়েও ভাল জিনিস পাই না, তাঁরা তখন হাতের কাছের জিনিস দিয়ে অসাধারণ সুস্বাদু সব রান্না করতেন।

আগেকার দিনে আটা চাকিতে পেষা হোত, সেই চাকিতে পেষা আটার গুণমান, মেশিনে পেষা আটার থেকে অনেক বেশি ছিল। আটা মেখে খানিকক্ষণ রেখে দেওয়া হলে আটার গুণমান বেড়ে যায়। এছাড়া দুধ, ডাল, তরকারি সব রান্নাই হোত ঢিমে আঁচে। বেশি আঁচে রান্না করলে খাবারের পুষ্টিগুণ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়।

নেচারোপ্যাথ ডাঃ ঈশ্বর শর্মার মতে, আজকাল আমরা বাজারে সব ঋতুতেই সবরকমের ফল, তরি-তরকারি পাই। অথচ যে সময়ের যে ফল বা সবজি তার গুণমান হয় বেশি। গরমকালে ঠাণ্ডা ফল-সবজি, যেমন— তরমুজ, শশা, আম, তালশাঁস, জামরুল, লাউ, কুমড়ো, পটোল, ঝিঙে, চিচিঙ্গে ইত্যাদি, শীতকালে গরম ফল-সবজি যেমন— কমলালেবু, আপেল, আঙুর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন ইত্যাদি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আর এখন, যখন যা পাই খেয়ে নিই, ফলে হজমের অসুবিধা দেখা দেয় আর আমরা ছুটি ডাক্তারের কাছে।

আগেকার দিনে মাটিতে বসে ধীরে-সুস্থে গল্প-গুজব করে খাবার খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এতে খাবার ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া হোত আর হজমও হোত। এখন সবসময় তাড়াহুড়ো। খাওয়াও একটা কাজ। কোনোরকমে গলাধঃকরণ করেই আবার ছোটো। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, খাবারের পাচনক্রিয়া মুখ থেকেই শুরু হয়। আর সেখান থেকেই আমরা গণ্ডগোল শুরু করি। সুতরাং একটু ধীরে ধীরে খেলে ক্ষতি নেই।

আজ আমরা অনেক কিছুর জন্য দৌড়চ্ছি, পেয়েও যাচ্ছি, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি। দেশি-বিদেশি নানারকম খাবারের ফাঁদে পড়ে আমরা আমাদের সাবেকি, পুষ্টিকর, সুস্বাদু খাবারগুলি হারিয়ে ফেলতে বসেছি। একটু সচেষ্ট হলে আমরাও ওই খাবারগুলি বানাতে পারব। পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব যখন আমাদেরই হাতে তখন চেষ্টা করতে কোনো ক্ষতি নেই। ■

কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির সমন্বয়

অতিথি কলম

এম জি বৈদ্য

আমি অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে আশুতোষ ভার্সানির প্রকাশিত প্রবন্ধটি পড়েছি। কিন্তু লেখাটি দু'ধরনের ব্যাধিতে ভুগছে। প্রথমটি হলো জাতি ও রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কে তাঁর বিভ্রান্তিকর ভাবনা-চিন্তা এবং আরেকটি হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সম্পর্কে তাঁর কুসংস্কার। আমি এই দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে কিছু বলবো না এবং পূর্ববর্তী বিষয়েই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো।

সেকুলার জাতীয়তাবাদী :

শ্রী ভার্সানি একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন 'সেকুলার জাতীয়তাবাদী'। আমি প্রথমেই বলতে চাই এখানে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব আছে কিনা। আমি শুধু স্বীকারই করছি না, জোর দিয়ে বলছি যে আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ সেকুলার।' এটা হওয়া উচিতই কেবল নয়, অবশ্যই হবে। রাষ্ট্র যে বিষয়টির সঙ্গে সমঝোতা করে চলছে, তাকে বলা যেতে পারে বৈশ্বিকতা। আধ্যাত্মিকতা এবং বিশ্বের অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে এর যোগ নেই।

আমাদের রাষ্ট্র তার জন্মলগ্ন থেকেই সেকুলার। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে এর উপক্রমনিকায় 'সেকুলার' শব্দটি যোগ করার পরই আমাদের রাষ্ট্র 'সেকুলার' হয়নি। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতারা, যারা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের আচার-আচরণ সেকুলার-বিরুদ্ধ, এই অর্থে যে তারা সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান আচরণ করেন না।

'রাষ্ট্র' এবং 'জাতি' :

যদিও 'রাষ্ট্র' এবং 'জাতি' পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু বিষয়গুলি আসলে মানসিকতা ও বিষয়গত দিক দিয়ে আলাদা। একটি 'রাষ্ট্রে' অনেকগুলি 'জাতি' থাকতে পারে। যেমনটি আমরা দেখেছি ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস (ইউ এস এস আর)-এর ক্ষেত্রে, অন্তত ১৯৮৫ পর্যন্ত। আবার একটি 'জাতি'র মধ্যে একাধিক 'রাষ্ট্র'ও থাকতে পারে। যেমনটা আমরা দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে। উদাহরণস্বরূপ ষষ্ঠ শতকে নর্মদার উত্তরে ছিল হর্ষবর্ধনের রাজত্ব, যেটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। একইভাবে এর দক্ষিণে ছিল পুলকেশীর রাজত্ব, যেটি আরেকটি রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের মানে :

রাষ্ট্র হলো রাজনৈতিক সম্মিলন। আমি ফরাসী লেখক আর্নস্ট বেকারকে উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, ''রাষ্ট্র হলো আইন-ব্যবস্থার সম্মিলন : একটি 'আইনত সংগঠিত রাষ্ট্র, অথবা আইনের শাসনের ছাত্রছায়ায় সংগঠিত রাষ্ট্র'। এটা আইনের জন্যই অস্তিত্ব বজায় রাখে, এটি আইনে এবং আইনের মধ্য দিয়েই নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। আমরা এমনকী এও বলতে পারি যে রাষ্ট্র আইন হিসেবেই বিরাজ করে। রাষ্ট্রের সৌরভ কার্যকরী আইনের প্রাণবন্ততাতেই আমোদিত এবং সেই অর্থের রাষ্ট্র মানে আইনের শাসন।'' (প্রিন্সিপালস অব্ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিয়োরি, পৃষ্ঠা ৮৯)।

একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োজন আইনকে কার্যকরী করার জন্য বাহিনী গঠন করা, যাদের সাহায্য ছাড়া আইনকে কোনোমতেই কার্যকরী করা যাবে না।

জাতির অর্থ :

জাতির অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। মানুষই হলো জাতি। একটি জাতিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে তিনটি প্রধান ফ্যাক্টর বা বিশেষত্ব কাজ করছে :

(১) প্রথম হলো জনগণের ভাবাবেগ, তারা যে ভূমিতে বাস করেন সেই সম্বন্ধে। তারা কি এটাকে নিছকই এক ভূখণ্ড, প্রাণহীন জড়পিণ্ড বলে ভাবেন? নাকি তারা একে মাতৃভূমির সম্মান করেন? যখন মানুষ একবার একে মাতৃভূমির সম্মান দিয়ে ফেলেন, তখন ভূমি-পরিবর্তনের ব্যাপারে এক ধরনের স্পর্শকাতরতা তৈরি হয়ে যায়। তখন তারা একে বিনা আবেগের, প্রাণহীন অস্তিত্ব বলে ভাবতে পারেন না। তখন তারা 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করতে গর্ববোধ করেন।

(২) মানুষের ভাবাবেগে জড়িত থাকে তাদের ইতিহাস এবং সেই সূত্রে তাদের পূর্বপুরুষেরা। ইতিহাসে যেমন জয়-উৎফুল্লতার ঘটনা নিহিত থাকে, তেমনি পরাজয় ও লজ্জার গ্লানিও তার মধ্যে থাকে।

(৩) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো খারাপের চেয়ে ভালোটাকে বেছে নেওয়া, এটাই তাদের মূল্যবোধ, এটাই তাদের সংস্কৃতি। আমি আবার উদ্ধৃতি দেব আর্নস্ট রেনানের। যিনি বলেছেন : 'মাটি জোগায় ভিত্তি, সংগ্রাম ও শ্রমের ক্ষেত্র তৈরি করে, মানুষ দেয় আত্মা। এখানে জড়পদার্থের

কোনো স্থান নেই। জাতি হলো আধ্যাত্মিক নীতি, ইতিহাসে একধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে। একটি আধ্যাত্মিক পরিবার এবং পৃথিবীর রূপরেখা নির্ণায়ক গোষ্ঠী কখনোই নয়।' তিনি আরও বলেন : 'দুটো জিনিস যা এই আত্মাকে অভিন্ন বা আধ্যাত্মিক নীতিকে সূচিত করে। এর মধ্যে একটি অতীতে বিরাজমান, অপরটি বর্তমানে। একটির অধিকারে রয়েছে অতীত গৌরবময়তা ও ঐতিহ্যের স্মৃতি এবং অপরটি প্রকৃত চুক্তি। একসঙ্গে থাকার ইচ্ছে এবং যৌথ উত্তরাধিকারের দায় বহন করা।

অতীতের গৌরবময়তাকে ভাগ করে নেওয়া এবং বর্তমানের জন্য একটি সাধারণ পরিস্থিতি তৈরি করা; সব মিলিয়ে একটি মহত্তম ভালো দলিল নির্মাণ করা এবং আরও ভালো করার ইচ্ছা— জনগণ হতে গেলে এগুলি আবশ্যিক। ভালোবাসা উৎসর্গেরই সমানুপাতিক যা কেউ তৈরি করতে পারেন এবং অসাধুতা কারোর জন্মগতও হতে পারে।' আমাদের দেশে জনগণের নাম হলো হিন্দু। সুতরাং এটা হিন্দু জাতি। এখানে তুমি আস্তিক কী নাস্তিক, এতে এর কিছু করণীয় নেই। তুমি প্রতিমা পুজোর পক্ষে না বিপক্ষে তাতে এর কিছু এসে যায় না।

ধর্ম ও রিলিজিয়ন :

আধ্যাত্মিকতা বোঝাতে বলা যেতে পারে হিন্দু হলো 'ধর্ম'। ধর্মের ব্যাপ্তি বিশাল। ইংরেজি ভাষায় 'ধর্ম' শব্দের কোনো যথার্থ প্রতিশব্দ নেই। 'রিলিজিয়ন'কে বড়জোর 'ধর্মে'র একটি অংশ বলা যেতে পারে। ড. এস রাধাকৃষ্ণন খুব তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেছিলেন : 'হিন্দুত্ব কোনো ধর্ম নয়; এটা বহু ধর্মের সাধারণ সম্পদ'। সুতরাং মূর্তিপূজার বিরোধীরা যেমন আর্যসমাজ কিংবা জৈন বা বৌদ্ধদের মতো যারা বেদকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে না তারাও হিন্দুত্বের ছাতার তলায় আসবেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর উপধারায়। এবং অবশ্যই জৈন্য, বৌদ্ধ ও শিখদের ক্ষেত্রে 'হিন্দু কোড বিল' প্রযোজ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে। 'হিন্দু কোড বিল' কথাটা ভালো করে খেয়াল করুন, খৃস্টান ও মুসলমানেরাও এই ছাতার তলায় স্বাগত যদি তাঁরা ভারত তথা হিন্দুস্থানকে তাদের মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেই মূল্যবোধের শিক্ষাকে গ্রহণ করেন যেখানে বিশ্বাস, রিলিজিয়ন এবং চিন্তা-ভাবনার বহুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। হিন্দু হলো 'ধর্ম' এবং আগেই বলেছি 'ধর্মে'র ব্যাপ্তি বিশাল।

একটি উদাহরণ :

আমি আমার জীবনের একটি ঘটনা বলতে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করছি। এটা ১৯৫৬ সালের ঘটনা। আমি নাগপুরে একটি খৃস্টান কলেজে শিক্ষকতা করি। আর এস এসের কর্মী হিসাবেই সেখানে আমার পরিচিতি সবার জানা।

একজন প্রবীণ খৃস্টান শিক্ষক, তিনি ওই কলেজে আমার প্রবেশের দুই দশক আগেই প্রবেশ করেছেন, একদিন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি আর এস এসের সদস্য হতে পারেন কিনা। আমি বললাম— 'হ্যাঁ'।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমায় কী করতে হবে?' আমি জবাব দিলাম : 'এর জন্য আপনাকে গির্জা কিংবা আপনাদের পবিত্র বাইবেল ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই।' তাঁর বিস্মিত মুখমণ্ডলের শিরায় যে কুঞ্চনের ছাপ পড়লো তা খেয়াল করতে আমি ভুল করিনি। আমি বলি, 'কিন্তু স্যার, আপনাকে অবশ্যই অন্যের বিশ্বাস ও আস্থার মর্যাদা দিতে হবে।' তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমি এটা গ্রহণ করতে অপারগ। যদি আমি এটা গ্রহণ করি, তাহলে আমি আমার রিলিজিয়নের প্রচার করতে পারবো না।' আমিও বলি, 'তাহলে আপনি আর এস এসের সদস্যও হতে পারবেন না।'

এখন রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে আসি। আগেই বলেছি রাষ্ট্রকে অবশ্যই সেকুলার হতে হবে, কারণ এটি জাগতিক বিষয়ীভূত। এখানে একটি সরকারি রাষ্ট্রীয় রিলিজিয়ন থাকার দরকার অবশ্যই নেই। তাদের রিলিজিয়নের রীতি-নীতি পালন করার স্বাধীনতা জনগণের অবশ্যই থাকা উচিত।

সেকুলার কী? :

ব্যক্তির সেকুলার হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। শুধুমাত্র চার্বাকের মতো কট্টর নাস্তিক সেকুলার হতে পারেন। সেকুলারিজম রাষ্ট্রের গুণগত মানের নির্ণায়ক হতে পারে, ব্যক্তির নয়, জনগণেরও নয়। আমাদের রাষ্ট্র তার জন্মলগ্ন থেকেই সেকুলার। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে এর উপক্রমনিকায় 'সেকুলার' শব্দটি যোগ করার পরই আমাদের রাষ্ট্র 'সেকুলার' হয়নি। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতারা, যারা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের আচার-আচরণ সেকুলার-বিরুদ্ধ, এই অর্থে যে তারা সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমান আচরণ করেন না। তাঁরা সস্তা রাজনৈতিক লাভের জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্ব করেন, এই কারণে তাঁরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কার্যকরী হোক তা চান না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণ :

বিবেচনা করুন, রাষ্ট্র হিসাবে ইন্ডিয়া তথা ভারত কেন সেকুলার, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ কেন নয়। আমি জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করছি যে মাত্র ৬৭ বছর আগেও তারা হিন্দুস্থানের অংশ ছিল। আমি আমার দেশের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত অন্যান্য দেশের নাম ইচ্ছা করেই নিচ্ছি না। কারণ ইন্ডিয়া তথা ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেবলমাত্র এই কারণেই আমাদের দেশে গণতন্ত্র অপ্রতিহতভাবে কার্যকর রয়েছে।

আর এস এস মহাত্মা গান্ধীকে সম্মান দেয়। প্রতিদিন সকালে স্তোত্রোচ্চারণে অন্যান্য মনীষী যাঁরা এই দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর নামও নেওয়া হয়। তবুও বলবো, মহাত্মা গান্ধী ভুল করেছিলেন রিলিজিয়ানের ভিত্তিতে দেশভাগ মেনে নিয়ে। সেগুলার বিরোধী এক বিশাল পদক্ষেপ এটি, যা দেশকে বহু শোচনীয় ঘটনার ভাগীদার করেছে এবং লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সেদিন যদি সবার মধ্যে হিন্দু-চরিত্র নিহিত থাকতো, আমি বলতে চাইছি হিন্দু জাতির কথা, তাহলে বোঝা যেত কোনো ধর্ম, কোনো বিশ্বাস তাদের অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়তো না এবং তাদের অধিকার ও ধর্মাচরণও সুরক্ষিত থাকতো। হিন্দু রাজা ও রাজত্বের এটাই ছিল গৌরবময় ঐতিহ্য।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা)

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের ৭৫ বছর

আশিস রায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের শঠতার ফলে Cripps Misssion পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। ফলে কংগ্রেস ও অন্য দলের নেতারা কিছুটা হতাশ হন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সারা বিশ্বে প্রচার করতে শুরু করে যে কংগ্রেসের পিছনে জনসমর্থন নেই। ভারতীয় জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ রয়েছে। তাই ভারত স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্য নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা এই কুৎসার জবাব দেননি। নেহরু ও আজাদ ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা ও মিত্রশক্তির সমর্থনের নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের মত ছিল আপসের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। অপরদিকে কংগ্রেস নেতা রাজা গোপালাচারিয়া প্রস্তাব করেন যে জাপানি আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হোক। কিন্তু এআইসিসি অধিবেশনে এই প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হয় এবং তিনি পদত্যাগ করেন।

এই অবস্থায় গান্ধীজী কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারত থেকে বৃটেনের অপসারণ দাবি করেন। গান্ধীজীর কণ্ঠে যথেষ্ট জঙ্গি সুর ছিল। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির ১৪ জুলাইয়ের (১৯৪২) অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারত থেকে অবিলম্বে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। শুধু ভারতের স্বার্থে নয়, সারা বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার স্বার্থে তা প্রয়োজন। বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করলে সব দলের সহযোগিতায় জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। প্রস্তাবে গান্ধীজীকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়। প্রস্তাবে গান্ধীজীর ‘ভারত ছাড়ো’ ধ্বনি পুনরায় ঘোষণা করা হয়।

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের জনসভায় গান্ধীজী।

৮ আগস্ট ১৯৪২ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আবার আন্দোলনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। সর্দার প্যাটেল প্রস্তাব দেন যে সাতদিনের মধ্যে গণসংগ্রামে জয়ী হবার জন্য কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করবে। গান্ধীজী স্লোগান দেন— ‘Do or Die’ (করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে)। ‘আমরা হয় ভারতকে স্বাধীন করবো অথবা সেই চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করবো।’ গান্ধীজী বলেন, ‘‘প্রতিটি ভারতবাসী নিজেকে যেন স্বাধীন মনে করে...শুধু জেলে গেলেই কাজ হবে না। যদি সাধারণ ধর্মঘটও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় তাহলেও আমি পিছিয়ে আসবো না।’’ এই উক্তি থেকে গান্ধীজীর মনোভাবের স্পষ্ট পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।

৮ আগস্টের মধ্যরাত থেকে ৯ আগস্টের মধ্যে কার্যকরী সমিতির সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এআইসিসি এবং সব প্রাদেশিক কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এই আকস্মিক আক্রমণে সারা দেশে সভা, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ, হরতাল প্রভৃতি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪২-এর অবিস্মরণীয় ‘আগস্ট সংগ্রামে’ জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের অগ্নিশিখা সীমাহীনভাবে জ্বলে ওঠে। জনতা-পুলিশের সংঘর্ষ নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উত্তেজিত জনতা সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ চালায়। রেলপথ, টেলিগ্রাফ লাইন, ট্রাম ও যোগাযোগ মাধ্যম ধ্বংস করা হয়। সরকারি অফিস, গাড়ি ও খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার আক্রান্ত হয় এবং এগুলিতে যথেচ্ছ অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস করা হয়। সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং বহু এলাকায় স্বাধীন সরকার গড়ে ওঠে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু মানুষ হতাহত হয়।

অধ্যাপক সুমিত সরকার আগস্ট আন্দোলনকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করেছেন। প্রাথমিক স্তরে বিশাল ও সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান সূচিত হয়েছিল। এই স্তরের আন্দোলন ছিল শহরভিত্তিক। ৯ থেকে ১৪ আগস্ট বোম্বাই শহর ছিল ঝড়ের কেন্দ্রভূমি। কলকাতায় ১০ থেকে ১৭ আগস্ট হরতাল ও সশস্ত্র আন্দোলন হয়। দিল্লীতে জনতা-পুলিশ সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। পাটনা শহর দুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন ছিল। লখনউ, বোম্বাই, কানপুর, নাগপুর ও আমেদাবাদে ধর্মঘট হয়। আমেদাবাদের সর্বত্র সাড়ে তিনমাস ধরে ধর্মঘট হয়।

আগস্টের মাঝামাঝি থেকে আন্দোলন দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরে সংগ্রাম ছিল গ্রামভিত্তিক। কাশী, পাটনা, কটক প্রভৃতি শহরে ছাত্ররা কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মূলত উত্তর ও পশ্চিম বিহার, বাংলার মেদিনীপুর এবং মহারাষ্ট্র কর্ণাটক ও ওড়িশার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল।

তৃতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম ছিল দীর্ঘতর। শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় সশস্ত্র পদ্ধতি আশ্রয় করে আন্দোলনে নেমে যান। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিহার-নেপাল সীমান্তে গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ পরিচালিত হয়। মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা মহারাষ্ট্রের সাতারা, ওড়িশার তালচের এলাকায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত বৃটিশ শাসকরা এই সব দুর্বল এলাকায় জাতীয় সরকার গঠন করার ঘটনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। তবে বৃটিশ সরকার এই গণ-আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করে। সারা ভারতকে একটি বিশাল জেলখানায় পরিণত করা হয়। প্রায় ১০ হাজার মানুষ বৃটিশের অত্যাচারে প্রাণ হারায়। বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা ৬০ হাজারের বেশি দাঁড়ায়।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা সেই সময় জেলে ছিলেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনে সেই সময় নেতৃত্বে ছিল অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবি দলের কর্মীরা এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করে সফল করার মতো শক্তি জনগণের ছিল না। প্রবল সরকারি আক্রমণের ফলে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত গণসংগ্রাম শীঘ্রই স্তিমিত হয়ে যায়।

'ভারত ছাড়ো' দাবিতে জনজোয়ার।

পরিশেষে বলা যায় যে আগস্ট আন্দোলনের প্রধান প্রবাহ জণগণের দ্বারা চালিত হয়েছিল। বহুক্ষেত্রে এই আন্দোলন ছিল বিক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধীজীর উপর থাকলেও তিনি আন্দোলনের কোনো কর্মসূচি নির্দেশ করতে পারেননি। তবে 'Do or Die' স্লোগানে ভারতবাসী অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আগস্ট আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতার দাবির দিকে সঠিকভাবে চালিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে আন্দোলন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আগস্ট আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর অভুত্থান ছিল অসম্পূর্ণ ও অসংগঠিত। কোথাও কোথাও শ্রমিক ধর্মঘট বা কৃষক আন্দোলন হলেও তা সারা ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়েনি। আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কোনো অবস্থাতে তিনি জনগণের সশস্ত্র আন্দোলনকে নিন্দা বা বিরোধিতা করেননি। অথচ পূর্বে এই ধরনের ঘটনাকে তিনি সম্মান দেননি। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হত্যালীলা দেখে বৃটিশদের সম্পর্ক গান্ধীজীর মোহভঙ্গ হয়েছিল।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক

পড়ুন ও পড়ান

স্বস্তিকা

প্রতি কপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

যুদ্ধবিমানের পাইলট (বাঁ দিক থেকে অবনী চতুর্বেদী, ভাবনা কান্ত ও মোহনা সিং)

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, এস বি আই কর্তা।

কল্পনা চাওলা,

সাক্ষী মালিক

পি ভি সিন্ধু

শুধু নারীশক্তির নয়, প্রয়োজন ঐশ্বর্যময়ী শক্তির জাগরণ

বিমলকৃষ্ণ দাস

নারীশক্তির জাগরণ, নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা— এগুলো নারীসমাজ সম্পর্কে দীর্ঘদিনের প্রচলিত কথা এবং অবশ্যই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ কথা, সমাজ অগ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব নিয়ে আজ এত কথা, বিচার, আন্দোলনের কারণ— এক সময় সহজভাবেই এদেশে নারীর গতি শিক্ষা থেকে শাসন পর্যন্ত সর্বত্রগামী ছিল, কিন্তু ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে নানা ঘটনায় পরবর্তীকালে তারা বেশির ভাগ পর্দার ওপারে চলে যায়। পিছিয়ে পড়ে তারা। নানা ডোরের বাঁধন তাদের চলার গতিকে শ্লথ করে তোলে। ফলত, রথের চলমান দুটি চাকার একটি যেন স্থিতিজাড্যের শিকার হয়ে পড়ে।

যুগের পরিবর্তন হয়েছে। নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা, কর্ম, নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা, অগ্রগামিতা পুরোনো সেই চিত্রকে আমূল বদলে দিয়েছে। ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে বর্তমানে নারীর সংখ্যা ৯৪৪, নারী শিক্ষার হার ৬৫.৪৬ (২০১১ জনগণনা)— যা স্বাধীনতার সময় ছিল শতকরা আটেরও নীচে। এত বছরে অগ্রগতির এ পরিসংখ্যান যদিও আশাপ্রদ নয়, কিন্তু এক সময়কার সেই গৃহকোণে বসে থাকা বা পড়ে থাকা নারী আজ আকাশ ছোঁয়ার কল্পনায়। শুধু ইতিহাসের স্বর্ণময়ী কল্পনা চাওলার মহাকাশ নয়, এ তাদের কল্পনার সর্বত্রগামিতার আকাশ। কোথায় যাচ্ছে না আজ মেয়েরা! যখন শুনি ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানে আমাদের মেয়েরা চালকের আসনে বসে মহাবেগে শত্রুনিধন কল্পে আকাশ চিরে ছুটছে, তখন হাজার জাতীয় পতাকা যেন বুকের মাঝে পত্পত্ করে উড়তে শুরু করে। এ গতি শুধু আকাশে নয়, এ গতি নারীশক্তির বিকাশের সূচক হয়ে সর্বক্ষেত্রে বর্তমান। মেট্রোরেল থেকে বিমানচালনা, পরিবার থেকে দেশচালনা, ক্রীড়াজগৎ থেকে বিজ্ঞানের জগৎ, অলিম্পিক থেকে সাগর সন্তরণ— সর্বত্র নারীর পদচারণা। পদচারণা হয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ হিমগিরি শৃঙ্গে, পদচারণা হয়েছে দক্ষিণ মেরুর হিমাঞ্চলে। আর ভারতীয় নারীর দেশচালনা, দেশের জন্য বলিদান সে তো ইতিহাসের স্বর্ণগাথা। প্রশাসন থেকে সৃজনশীলতা, গবেষণা কর্ম থেকে সাহিত্যকর্ম, শিক্ষার অঙ্গন থেকে সেবাকার্য, স্বনির্ভরতার যোজনায় সর্বত্র নারীর জয়জয়কার। সমাজে নারীর কোনো অধিকার খর্ব না হয়, তার অবমাননা না হয় তা দেখাশোনার জন্য হয়েছে নানাস্তরে মহিলা কমিশন। এত আলোর ছবি, কিন্তু এর মধ্যেও যখন দেখি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'বেটী বাঁচাও, বেটী পড়াও' ধ্বনি নিয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয় তখন মনে বহুবিধ প্রশ্ন এসে ঠাঁই নেয়। এ অন্ধকার কেন? নিত্য খবরের কাগজ পড়ে ক্ষুণ্ণ হই, ব্যথিত হই, ক্ষুব্ধ হই। যখন শক্তির আধার নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, তখন স্তম্ভিত হয়ে উর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে

থাকি। যখন নারীর অবমাননা, বধূহত্যা, শিশুর যৌন নিগ্রহের কথা শুনি তখন লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে, নিজেকে নিজে ধিক্কার দিই, ছিঃ— বলে মাটিতে পদক্ষেপ করি। তখন যদি ধরণী দ্বিধা হোত— আমি হয়তো কর্তব্য থেকে রেহাই পেতাম, কিন্তু দুঃসহ যন্ত্রণা অপমান থেকে সমাজের, মানুষের মুক্তির পথ কী? এক বৃহত্তর প্রশ্নচিহ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। সর্বত্র নারীশক্তি বিকাশের যখন এমন উদাহরণ সেখানে অন্ধকারময় এ বৈপরীত্য কেন! এত সমালোচনা, এত বিচার, শাস্তি, চরমতম দণ্ড--- তাও এর শেষ নেই, বরং যেন রক্তবীজের বংশ হয়েছে দুষ্কৃতীরা।

কঠোর সমালোচক বলবেন এ হলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিণতি। কেউ বলবেন— এ আগেও হোত— আগে এত মিডিয়া ছিল না বলে সব জানা যেত না। প্রথম কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমার লেখার প্রথমাংশে এর উত্তরসূচক একটা আভাস দিয়েছি। তবে সেটা ছিল নারীর অনগ্রসরতার প্রেক্ষিতে। দ্বিতীয় কথার মধ্যে পরোক্ষে হলেও কিছু সত্য আছে। সমাজের মধ্যে কোনোরকম বিকৃতি কখনও ছিল না তা নয়। কিন্তু এখন তা মিডিয়ার কল্যাণে মুহূর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কাগজের পৃষ্ঠা জুড়ে বিবরণ, আলোচনা-সমালোচনায় টিভির পর্দা চঞ্চল হয়ে ওঠে। অথচ এমন অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত দৃঢ় পদক্ষেপ, শাস্তি, প্রতিরোধ, প্রতিবাদে কোথাও আত্মবলিদান, আবার অন্যত্র শ্রদ্ধা, ভালবাসা সৌহার্দ্য, রুচিশীলতা, শিষ্টাচারের যে হাজার উদাহরণ দেশজুড়ে রয়েছে, তা তেমন করে তুলে ধরা হয় না, খোঁজা হয় না। কখনও মনে হয় এই 'বিকৃতি' বুঝি মহামারী রূপ নিয়েছে। আদৌ তা নয়। এতে বর্তমান কিশোর-তরুণদের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

প্রশ্নের অন্যদিক। নারীর অপমানে স্বয়ং নারী কতটা সরব। কামদুনি, পার্কস্ট্রিট, নির্ভয়াকাণ্ডে এক দুরন্ত প্রতিবাদের, প্রতিকারের ঝড় তৈরি হয়েছে ঠিকই কিন্তু যে অসুস্থতা নিত্য আমাদের জীবনী শক্তিকে ক্ষয় করে চলেছে সেখানে আমরা প্রায় নীরব। যা করি তার প্রায় সমস্তটাই প্রতিক্রিয়া। অসুস্থ হয়ে ওষুধ ব্যবহারের চেয়ে প্রতিষেধক গ্রহণই তো শ্রেয়। কোনো একজন নারীর অবমাননা হলে তা হয় সেই একজন নারীর অপমান, কিন্তু যখন কোথাও নারীত্বের অবমাননা হয় তখন তা হয় সমস্ত নারী সমাজের অপমান। তখন তো সমস্ত নারী-সমাজেরই গর্জে ওঠা উচিত। যখন সাধারণ পঞ্জিকা থেকে শুরু করে, স্বনামধন্য ম্যাগাজিন, খবরের কাগজসমূহে বিজ্ঞাপনের নামে নারীকে পণ্য করে কুরুচিকর ছবি ছাপা হয়, তখন যে নারীত্বের অপমান হয় তখন তার জন্য প্রতিবাদ কোথায়? যখন কোনো নারী স্বল্পবাসে ক্যামেরার সামনে তার অঙ্গ সৌন্দর্যকে বিক্রি করতে নারীর শীল সম্ভ্রমকে ভূলুণ্ঠিত করে তখন নারী সমাজের পক্ষ থেকে ধিক্কার জানানো হয় না কেন? যখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী প্রকাশ্যে 'kiss of love' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, 'ন্যাপকিন আন্দোলন'-এর নামে নারীর মর্যাদাকে রসাতলগামী করে তখন নারীত্বের অবমাননাকারী সেই বিকৃতমনা ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে না কেন? এই কি নারী স্বাধীনতা! এই কি মুক্তচিন্তা! নাকি ধ্বংসের আনন্দ! ভয়ঙ্করের সৌন্দর্য উপভোগ মানুষের এক আদিম প্রবণতা। ভাঙার আনন্দ হয় ক্ষণিকের, পরিণতি তো ধ্বংসই। পরিবার তার শৃঙ্খলা, সংস্কৃতি, শিষ্টাচার সবকিছু ভাঙার যেন এক মহোৎসব চলছে। সংস্কার আর সংহার যে এক জিনিস নয় একথা কবে বোঝা যাবে? নক্রকে আহ্বান নয়, নেকড়েকেও আহ্বান নয়; আহ্বান করতে হবে নারী-উত্তম বা নরোত্তমকে।

সহজাত রূপে মানুষের মধ্যে ঠাঁই নেওয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপী নেকড়েগুলোকে বিবেকের বশে এনে সংযত করতে আজ শুধু নারীশক্তি নয়, নারীর ঐশ্বর্যময়ী শক্তির জাগরণ প্রয়োজন। কী এই ঐশ্বর্যময়ী শক্তি, কী তার রূপ! সহজ কথায় যে শক্তি মানব সমাজকে ঐশ্বর্য প্রদান করতে পারবে তাই ঐশ্বর্যময়ী শক্তি। অর্থ সম্পদ সমাজের প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়, প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো সেই সমাজের মানুষের মধ্যকার মনুষ্যত্ব, দেবত্ব। আত্মচেতনা সেই কাজ সম্পূর্ণভাবে নারীর অবদানেই সম্ভব। প্রাচীনকালের মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতীর কথা না বললেও বর্তমানের শ্রীশ্রীমা সারদা, ভগবতী দেবী, ভুবনেশ্বরী দেবী, প্রীতিলতা, লক্ষ্মীবাঈ এমন সহস্র সহস্র নারীর মধ্যে তাঁদের ঐশ্বর্যময়ী রূপ দেখতে পাই। আজও সেরূপ দেখছি। নতুবা এতসব কাজ কেমন করে হচ্ছে! ইন্দো-তিব্বত বর্ডারে মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়ন, মাস মিডিয়ার ছাত্রী প্রদন্য পান্ধাবের মুম্বই কান্দিভেলি স্টেশনে অশালীন আচরণকারী এক মদ্যপ যুবককে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে পুলিশের খাঁচায় নিয়ে গিয়ে জমা দেওয়া— এরকম সব কি এমন শক্তির উদাহরণ নয়? তবে নারীর ঐশ্বর্যময়ী শক্তির স্পষ্ট সঙ্কেত পাই শ্রীশ্রী চণ্ডীতে, মহিষাসুর বধের পরে দেবী স্তুতিতে—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, যা দেবী সর্ব ভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা...'। —যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে শ্রদ্ধারূপে চেতনা, বুদ্ধি, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা শান্তিরূপে অবস্থিতা তাঁকে বারংবার নমস্কার করি। প্রতি পরিবারে শুধু একজন মায়ের মধ্যেই যদি এরূপ সামর্থ্য দেখা যায়, সবার জন্য, সবার প্রতি, সর্বত্রগামী সকলের মঙ্গল চিন্তা, ঐশ্বর্যময়ী শক্তির স্পর্শে ঘরে ঘরে মানুষ তৈরি হবে, বিবেকবান সু-সংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নির্মাণ হবে। তখন ফাঁসির ধনঞ্জয় বিলুপ্ত হয়ে প্রকৃত ধনঞ্জয় আবির্ভূত হবে, নির্ভয়ার বিভীষিকা লুপ্ত হয়ে নির্ভয় বিরাজিত হবে। নারীর ঐশ্বর্যময়ী শক্তির বিকাশ তৈরি করবে এমন এক সুসংহত ভাব আন্দোলন যা পরিশীলিত করবে মানুষের বোধকে, জাগ্রত হবে চেতনা। তখন বিকৃতি থেকে মানুষ সুকৃতির দিকে অগ্রসর হবে। স্বাধীনতার যুগে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি দুটি খুব প্রচলিত ছিল— 'না জাগিলে আর ভারত ললনা/এ ভারত আর জাগে না জাগে না'। মাতৃশক্তির জাগরণ। এই কবিতার শেষ দুটি লাইন ছিল--- 'তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,/এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' এখানে ছিল নারীর ঐশ্বর্যময়ী শক্তিকে আহ্বান। আজও এ আমাদের শুধু কামনা নয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা। ***(লেখক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক)***

একুশ শতকের সংস্কৃত গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংস্কৃত গ্রাম বললে মানেটা ঠিক স্পষ্ট হয় না। কিন্তু যদি বলা হয় এমন একটি গ্রামের কথা যেখানকার সবজিওয়ালা থেকে পুরোহিত, সাধারণ গৃহবধু থেকে কলেজপড়ুয়া যুবক— সকলেই সংস্কৃতে কথা বলেন তা হলে বোধহয় বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কর্ণাটকের শিমোগা জেলা। এই জেলারই অন্তর্গত মাত্তুর গ্রাম। টুঙ্গা নদীর তীরবর্তী গ্রামটির বাইরের রং সবুজ কিন্তু অন্তরটি এখনও গৈরিক। অপরিচিত কেউ যদি গ্রামের কারও বাড়িতে যান প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'ভবতম্ নাম কিম্?' অর্থাৎ আপনার নাম কী? 'কথম্ অস্তি'? অর্থাৎ, কেমন আছেন? কফি বা চায়ম কিম ইচ্ছাতি ভবান? অর্থাৎ, কী খাবেন, চা না কফি?

ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে অবাক করে দেবার মতো ঘটনা কিছু কম নেই। কিন্তু তাই বলে একুশ শতকে সংস্কৃতে কথাবলা গ্রাম! হ্যাঁ তাই। মাত্তুরের বাসিন্দারা বৈদিক যুগের রীতিতে জীবনযাপন

টুঙ্গা নদীর তীরে বেদপাঠের আসরের একটি দৃশ্য।

করেন, প্রাচীন সংস্কৃত স্তোত্রপাঠে তাদের জুড়ি মেলা ভার— এমনকী সাধারণ ঘরোয়া কথাবার্তার মাধ্যমও সেই সংস্কৃত। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক সংস্কৃত ভাষার বিকাশে সদাই তৎপর। অথচ কয়েক দশক আগেও মাত্তুর ছিল একটা সাধারণ গ্রাম। ১৯৮১ সালে সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারে নিবেদিতপ্রাণ সংস্কৃত ভারতী মাত্তুরে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল। সংস্কৃত ভারতীর পক্ষ থেকে সেই ওয়ার্কশপে মাত্তুরকে একটি সংস্কৃত গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। মাত্তুরের লোক সাড়া দিয়েছিল সেই ডাকে। অতঃপর ধীরে ধীরে বৈদিক শেকড়ের দিকে ফিরে যাওয়া। এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা চাষবাস। বাদাম ও ধানের চাষই বেশি হয়। সব কৃষিজমি গ্রামের একদিকে। অন্যদিকে বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি। কাছে না থাকলে আপনজন হওয়া যায় না, তাই! গ্রামের প্রায় সকলেই সাঙ্কেতি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। আনুমানিক ৬০০ বছর আগে এরা কেরল থেকে মাত্তুরে এসেছিলেন। কেরলে থাকার সময় এরা স্থানীয় সাঙ্কেতি ভাষায় কথা বলতেন। এখনও মাঝে মাঝে বলে থাকেন। ভাষাটি সংস্কৃত, তামিল, কন্নড় ও কিছু কিছু তেলুগু শব্দ মেশানো একটি উপভাষা। নিজস্ব বর্ণমালা নেই। লেখার সময় দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করতে হয়।

চতুষ্কোণ আকৃতির গ্রামের মাঝখানে একটি মন্দির আর তার পাশে পাঠশালা। সেখানে প্রাচীন রীতি মেনে বেদপাঠ হয়। শিক্ষার্থীরা পাঁচ বছরের পাঠক্রমে নিশ্ছিদ্র অভিনিবেশ সহকারে বেদ-বেদান্তের পাঠ নেয়। অভিভাবকত্ব করেন গ্রামের প্রবীণেরা। সকলেই সংস্কৃত বোঝেন। হিন্দুশাস্ত্র এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে সকলেই ওয়াকিবহাল। বিদেশ থেকেও সংস্কৃতের পাঠ নিতে আসে ছাত্ররা। গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারের কেউ না কেউ অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। মাত্তুরের ভোর হয় টুঙ্গা নদীর ধারে। সেখানে সারা গ্রাম মিলিত হয় বেদপাঠের জন্য। সামগানের সুরে সময় পিছিয়ে যায় কয়েক হাজার বছর। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, আজকের টেক-স্যাভি প্রজন্মও এই বেদপাঠে অংশগ্রহণ করে আবার মোবাইলে ছবিও তুলে রাখে।

মাত্তুরের আতিথেয়তাও জগদ্‌বিখ্যাত। অতিথি কোনো একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে আসেন কিন্তু আতিথ্যের ভার নেয় গোটা মাত্তুর। ভারতের অন্যান্য প্রান্ত বা বিদেশ থেকে যারা পড়তে আসে তারাও গ্রামের অতিথি। শিক্ষা যেহেতু দান করার জিনিস, তাই কোনোরকম বিনিময় এখানে নিষিদ্ধ। এখনও পর্যন্ত মাত্তুর দেশকে ৩০ জন সংস্কৃত ভাষার সুপণ্ডিত উপহার দিয়েছে। তাঁরা বর্তমানে কুভেম্পু, বেঙ্গালুরু মাইসোর, ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। মাত্তুরের পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট জেলার মধ্যে সব থেকে ভালো। শিক্ষকদের অভিমত, সংস্কৃত পাঠ গণিত ও বিজ্ঞানের মেধার বিকাশে সহায়তা করে। কথাটা যে উড়িয়ে দেবার মতো নয় তার প্রমাণ মাত্তুরের বহু ছেলে এখন বিদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছে। গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে অন্তত একজন করে সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাবে। প্রাচীন আর আধুনিকের এই মেলবন্ধন দেখে সত্যিই তাক লেগে যায়।

সন্ধ্যে নামার পর মাত্তুর সুরে ডুবে যায়। মন্দিরের চাতালে বসে গমকের আসর। 'গমক' এক ধরনের গান, কাব্যবচন নামেও পরিচিত। একজন গায়ক প্রথমে কথার সঙ্গে মানানসই সুরে একটি পদ গেয়ে শোনান। অন্য একজন পদটির ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করেন। গানের সুর নেওয়া হয় প্রাচীন কন্নড় লোকসঙ্গীত থেকে আর কথা নেওয়া হয় জৈমিনি ভারত, হরিশ্চন্দ্র কাব্য, অজিত পুরাণ এবং তোরেভ রামায়ণ থেকে। এইভাবে ধ্রুপদী থেকে লোকায়তে অনায়াসে যাতায়াত করে মাত্তুর। কোথাও একবিন্দু ঝাঁকুনি লাগে না। আবার আধুনিকতার বিজয়রথও থামাতে হয় না।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

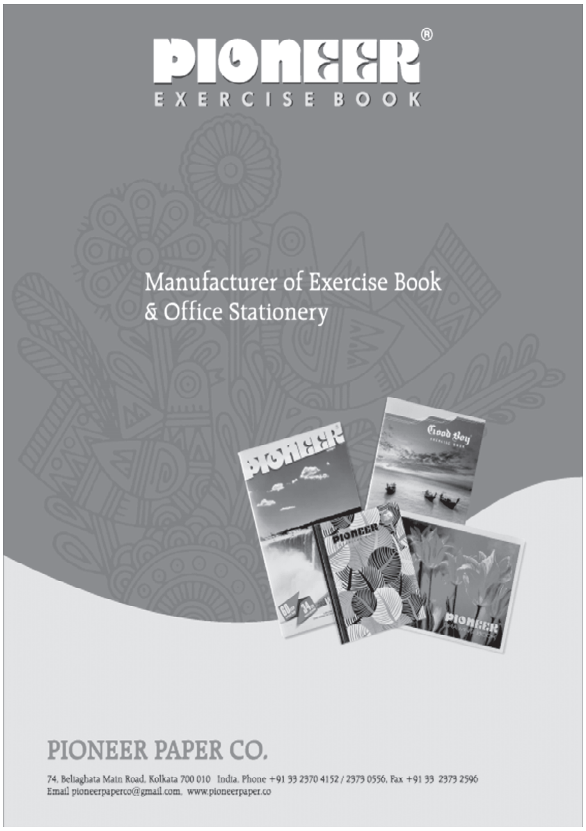

‘মানবজাতির ইতিহাসে যত জ্ঞানী আবির্ভূত হয়েছেন, নিশ্চিতভাবে শ্রীবুদ্ধ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁর প্রশান্ত বুদ্ধি, যা অত্যন্ত প্রখর ছিল, চল্লিশ বৎসরের অধিক ভারতকে পরিচালিত করেছে; যদিও অসীম করুণা এবং সহানুভূতিই মানবজাতির সেবায় তাঁকে এত তীব্রভাবে প্রবুদ্ধ করেছিল। তাছাড়া তাঁর মধ্যে অতি উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিমত্তা, হৃদয়বত্তা এবং কর্মদক্ষতা— এই তিন অনুভূতির সমন্বয় ঘটেছিল।’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সমাবেশ সমাচার

‘শ্রদ্ধা’র ৭৭তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৪ আগস্ট দুর্গাপুরের বেনাচিতি নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ৯৭ বছর বয়স্ক কমলেশ কুমার ঘোষকে ‘শ্রদ্ধা’ ৭৭তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে সিউড়ি প্রণবানন্দপল্লী নিবাসী তাঁর কন্যা শ্রীমতী শ্যামলী দত্তের বাড়িতে।

কমলেশ ঘোষ পরাধীন ভারত ও স্বাধীন ভারতে পুলিশ সংস্থায়, কখনও পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষক বা বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলাতে পুলিশ থানাতে আধিকারিক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর চাকুরি জীবনে নির্লোভ স্বচ্ছতা, শারীরিক দক্ষতা, পোশাকের স্বচ্ছতা ও নকশাল আন্দোলন দমনে বিশেষ দক্ষতার জন্য স্মারক পুরস্কার রুপোর পিস্তল (মডেল) ও শংসাপত্র লাভ করেন।

তিনি পুলিশ ব্যারাকের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাত্রা, নাটক অভিনয় ও পরিচালনা করতেন। এরকম একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে ‘শ্রদ্ধা’ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে ধন্য হলো।

তিনবার ‘ওঁ’ ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন ব্রহ্মচারী গৌতম মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুগায়িকা শ্রীমতী অলকা গাঙ্গুলী। শ্রী ঘোষকে পা ধুইয়ে চন্দন ফুল দিয়ে পূজা করেন তাঁর কন্যা। পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয়, মিষ্টান্ন, ফলের ডালা, গীতা, মানপত্র তাঁকে অর্ঘ্যস্বরূপ দান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন ‘শ্রদ্ধা’র সভাপতি নিরঞ্জন হালদার। প্রস্তাবিক ভাষণ দেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। পরিবারের পক্ষে বলেন মধ্যমকন্যা শ্রীমতী শ্যামলী দত্ত। সমগ্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সঞ্চালন করেন সাংবাদিক ও শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। সর্বশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

মালদহের বাচামারী বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরের মতো এবছরও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস তথা জন্মাষ্টমীর দিন অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতা। এই দিন শিশু মন্দিরের অরুণ ও উদয় শ্রেণীর ৮৭ জন শিক্ষার্থী ভাইবোন কৃষ্ণ সেজে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলার বিখ্যাত মৃৎ ও ভাস্কর্য শিল্পী সজল পণ্ডিত, বিশিষ্ট মুকাভিনয়বিদ নিশীথ মণ্ডল, শিশু মন্দিরের সম্পাদক অধ্যাপক বিজয় ঘোষ প্রমুখ। প্রতিযোগিতার পর কৃষ্ণরূপী ভাই-বোনদের নিয়ে শিশু মন্দিরের অভিভাবকদের সহযোগিতায় ১৩টি টোটো করে প্রায় ২ কিলোমিটার পথ নগর কীর্তন সহযোগে পরিক্রমা হয়। পরে শিশু মন্দিরের আচার্যরা স্বহস্তে তৈরি করা লুচি, পায়েস, ক্ষীরের নাড়ু, তালের বড়া ইত্যাদি প্রসাদ হিসেবে কৃষ্ণরূপী ভাইবোনদের ভোজন করান। শিশু মন্দিরের সম্পাদক কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিশেষ ৬ জনকে উপহার স্বরূপ গোপাল ও সকলকে গীতা প্রেসের একটি করে পুস্তক তুলে দেন সজল পণ্ডিত-সহ উপস্থিত অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান শেষে সম্পাদক মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের আলোচনা সভা

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও কৃষকদের বর্তমান পরিস্থিতি ও সমস্যার বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী এস এস আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পক্ষে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ কুমার মণ্ডল, সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়, জৈবিক প্রমুখ ভানু থাপা ও সদস্য সুব্রত সেন গত ১৬ আগস্ট শিলিগুলিতে মাধব ভবনে এক আলোচনা সভায় মিলিত হন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা হয় :

১। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ গত এক বছর ধরে ধান ও পাটের উৎপাদন ব্যয়ের উপর সমীক্ষা করে জানতে পেরেছে ধানের উৎপাদন ব্যয় প্রতি কুইন্টাল ১৭০০ টাকা এবং পাটের ৪৫০০ টাকা। কিন্তু কেন্দ্র সরকার ধানের মূল্য নির্ধারণ করেছে ১৪৭০ টাকা এবং পাটের মূল্য ৪৭০০ টাকা। কেন্দ্রের ঘোষিত মূল্যেও চাষি ধান বিক্রয় করতে পারছে না। কারণ এতেও রাজনীতি চলে। পাটের ক্ষেত্রেও তাই। একমাস আগে পাট বিক্রি হোত ৫০০০ টাকার বেশি দামে। বর্তমানে চাষির ঘরে পাট রয়েছে, তাই দাম কমে ৩০০০ টাকায় এসেছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষক চাষের প্রতি উৎসাহ হারাচ্ছে। এর সমাধান কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। কেন্দ্র সরকার বার বার ঘোষণা করছে কৃষকদের কিষান ক্রেডিট কার্ড বাধ্যতামূলক। কিন্তু ক্রেডিট করতে গিয়ে কৃষকরা হতাশ, কারণ পৈতৃক সম্পত্তি সন্তানের অধিকার হওয়া সত্ত্বেও তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেহেতু নিজের নামে কোনো জমিজমা নেই। এই ব্যবস্থার কিছু সমাধান না হলে প্রকৃত চাষি সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

৩। সরকার জৈবিক চাষ করার জন্য প্রচার করছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারি ভাবে কৃষি-বিজ্ঞানী দ্বারা জৈবিক চাষের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দ্রুত চালু করা প্রয়োজন। জৈবিকের নাম করে কিছু সংস্থা কৃষকদের প্রতারণা করার ব্যবসাও ইতিমধ্যে শুরু করেছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে এদের বিরুদ্ধেও সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

৪। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সিকিম রাজ্যকে জৈবিক রাজ্য ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেখানকার কৃষকদের মনে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারণ জৈবিক রাজ্যের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রক্রিয়া কিছুই শুরু করা হয়নি। তাই সেখানকার কৃষকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে কেন্দ্র সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে।

৫। কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে এলাকা ভিত্তিক গোবর গ্যাস প্রজেক্ট তৈরি (বড়ধরনের) করা দরকার। গ্যাস থেকে মিথেন গ্যাস সিলিন্ডার জাত করে কম খরচে কৃষকদের দেওয়া যেতে পারে। বাকি হাইড্রোজেন ইত্যাদি অন্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্যাসবিহীন তরল গোবর থেকে উৎকৃষ্ট ভার্মিসার দ্বারা জৈব চাষ বৃদ্ধি সম্ভব। এর ফলে গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষ, পশুপালন ইত্যাদি এনজিও-র মাধ্যমে পরিচালিত কৃষিকাজের সহায়ক হিসাবে কিছু উদ্যোগ দেওয়া হয়েছে। সব কথাই মনোযোগ সহকারে মন্ত্রী মহোদয় শুনেছেন এবং গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানানো হয়।

দিনহাটায় পরিবার প্রবোধন সভা

গত ২৩ আগস্ট কোচবিহার জেলার পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে দিনহাটা মণ্ডলমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থে ১৬টি পরিবারকে নিয়ে পরিবার প্রবোধন সভা ও রাখিবন্ধনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় নাজির হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী সুপ্রভা ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা নগর সঙ্ঘচালক কল্যাণকুমার পাল ও দিনহাটা মহকুমা প্রচারক সুধীর চন্দ্র মণ্ডল। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল উপস্থিত থেকে 'আদর্শ হিন্দু পরিবার কেমন হওয়া উচিত' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বর্তমানে হিন্দু সংখ্যা কমে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা ব্যক্ত করেন। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দিনহাটা নগর কার্যবাহ জয় ঘোষ।

দুর্গাপুরে স্বাধীনতা দিবসে ভারতমাতা পূজা

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের পরিচালনায় সেবা সংস্থা বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে দেশের ৭০তম স্বাধীনতা দিব উদযাপন উপলক্ষে সেবা কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ঋষি অরবিন্দের জন্ম জয়ন্তী এবং ভারতমাতা পূজা হয়। সকালে জাতীয় পতাকার উত্তোলন ও ঋষি অরবিন্দের স্মরণে অনুষ্ঠান, বিকালে সমস্ত কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী এবং মায়েদের নিয়ে 'ভারতমাতা' পূজা হয়।

বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ৫টি স্থানে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

দিনহাটা মদনমোহন সারদা তীর্থের উদ্যোগে রাখিবন্ধন

দিনহাটার মদনমোহন পাড়া সারদা শিশুতীর্থের উদ্যোগে পালিত হলো রাখিবন্ধন উৎসব। এদিন শিশুতীর্থের আচার্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ভাই ও বোনদের নিয়ে স্থানীয় শহরের দমকল বিভাগের কর্মী, হাসপাতালের কর্মী ও রোগী, সরকারি কার্যালয়ের কর্মীদের হাতে রাখি বাঁধা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য যে, দিনহাটা সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সীমান্তের বিওপি-গুলোতে (সেউতি, কুর্শাহাট, নটকোবাড়ি, কদমতলা, ধাশরা) বিএসএফ ভাই-বোনদের হাতে রাখি বাঁধা হয়। আধা সামরিক বাহিনীর কর্তব্যরত কর্মীরা বিশেষভাবে আপ্লুত হয়ে শিক্ষার্থীদের এই কর্ম প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। বিএসএফ-এর তরফ থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে চকলেট তুলে দেওয়া হয়।

হাওড়া জেলার বেগড়ি গ্রামে ভারতমাতা পূজা

ডোমজুড় খণ্ডের বেগড়ি গ্রামে গত ১৫ আগস্ট অখণ্ড ভারত দিবস ও শ্রী অরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ভারতমাতা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ আগস্ট গ্রামের মানুষ শোভাযাত্রা সহকারে বিকালে ভারতমাতার মূর্তি আনেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় ইসকন মন্দিরের বিজয়নিতাই দাসের পরিচালনায় নাম সংকীর্তন ও গীতা পাঠ হয়। ১৫ আগস্ট পুণ্য প্রভাতে ভারতমাতার সামনে একাত্মতা মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ হয়। তারপর ভারতমাতা পূজন সমিতির সভাপতি অজিত মণ্ডল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সকাল ১০টায় রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার্থে রাখিবন্ধন করা হয়। গৌতম কর্মকারের ব্যবস্থাপনায় স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠের প্রতিযোগিতা হয়। আবৃত্তি শিক্ষিকা শ্রীমতী ছন্দা দাস ও প্রাক্তন সমরকর্মী তথা প্রাথমিক শিক্ষক সুরজিৎ বসু প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বিকালে সভায় সনাতন মাহাতো ও অনির্বাণ দেব ইতিহাসসমৃদ্ধ ও তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজকুমার ঘোষ। রূপেন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে স্থানীয় বিবেকানন্দ সেবা সমিতির সদস্যরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন।

সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার রাখিবন্ধন

গত ১৮ আগস্ট সংস্কার ভারতী সোনারপুর গ্রামীণ শাখার উদ্যোগে সোনারপুর শীতলা গ্রামের বৃদ্ধাশ্রম 'সুখী নীড়' থেকেই রাখিবন্ধনের সূচনা করেন শাখার সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল। ছিলেন শাখার সংগঠন সম্পাদক শেখর মণ্ডল ও অন্য সদস্যগণ। বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে প্রণম্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। পরে সোনারপুর বাজার মোড়ে পথ চলতি ব্যক্তিদের রাখি পরানো হয়। সোনারপুর থানা চত্বরে ইনচার্জ সহ উপস্থিত কর্মীদের রাখি পরানো হয়।

স্বস্তিকার একনিষ্ঠ পাঠক কাজল রায় বর্মনের দেহাবসান

আমরা যারা স্বস্তিকার গ্রাহক, তাদের কাছে স্বস্তিকার ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা; স্বস্তিকার কথা আমাদের প্রাণের কথা। জাতীয়তাবাদের এমন উদাত্ত কম্বুকণ্ঠ আহ্বান আমাদের উতলা করে তোলে। সপ্তাহান্তে পত্রিকাটির আগমনের অপেক্ষায় স্বস্তিকার একনিষ্ঠ পাঠকগণ পথ চেয়ে বসে থাকেন। পত্রিকাটি পাঠকদের কাছে কত প্রিয় তার একটি উদাহরণ সদ্য প্রয়াত কাজল রায় বর্মন।

কাজল রায় বর্মন কলকাতার অশীতিপর একজন স্বয়ংসেবক যিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় স্বস্তিকা পড়তে পড়তেই ৮২ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি তাঁর কলেজ জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আগরতলা শাখায় যেতেন এবং জীবনে সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রেখে বীর সাভারকর, একনাথ রাণাডে প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে ধন্য করেছেন।

২০ বছর আগে কলকাতার নাকতলায় এসে এখানকার বাসিন্দা হয়ে স্বস্তিকার নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহক হন।

বাঁকুড়া জেলায় সংস্কৃত দিবস উদযাপন

গত ১৭ আগস্ট বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় সভাগৃহে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সন্তু সিংহ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন যে, অনেকেই মনে করেন, সংস্কৃত ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ; কিন্তু প্রখর রৌদ্রও যেমন দুর্বাঘাসকে বিনাশ করতে পারে না, তেমনি ভারতবর্ষের বুক থেকেও সংস্কৃতভাষার বিনাশ অসম্ভব। আজ দেশে এত প্রচুর সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত শিক্ষায় এগিয়ে আসা এই সত্যেরই সূচক। তবে নিছক ক্যারিয়ার গড়ার জন্য নয়, সংস্কৃতকে ভালবেসে সংস্কৃত পড়ার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান। বিভাগীয় প্রধান সন্তু সিংহ বলেন, সুমহান ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি হলো সংস্কৃতভাষা। তাই এর সংরক্ষণ ও চর্চা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

পরদিন ১৮ আগস্ট বাঁকুড়ার পাঞ্চজন্য ভবনে বাঁকুড়া জেলা 'সংস্কৃত ভারতী'র উদ্যোগে দিনটি পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের অধ্যাপক মানস চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে শ্রী চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসারের কাজে এগিয়ে আসার জন্য বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক অধ্যাপক ও সংস্কৃতপ্রেমী মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

১৯ আগস্ট জেলার গঙ্গাজলঘাটী থানার কাপিস্থা উচ্চ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সম্পাদক তথা পরিচালন সমিতির বর্তমান সদস্য দুলাল উপাধ্যায়, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত ভারতীর প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষিকা দিলীপ সরকার ও সুভদ্রা দত্ত প্রমুখ। শ্রী উপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে সংস্কৃত চর্চায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উৎসাহের সবিশেষ প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা সংস্কৃত ভারতীর কার্যকর্তা সুখময় মাজী বলেন, প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে পবিত্র শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শিক্ষাগ্রহণের শুভসূচনা হোত। এই পরম্পরাকে স্মরণে রেখেই এই দিনটিকে সংস্কৃত দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

অন্যতম শিক্ষক তপন কুমার ঘোষাল শিক্ষার্থীদের সিলেবাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে সংস্কৃতচর্চার এই ব্যতিক্রমী প্রয়াসে সানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বেশ কয়েকটি সংস্কৃত সঙ্গীত পরিবেশন করা বা 'শঠে শাঠ্যং' শীর্ষক একটি নাটিকাও দর্শকদের মুগ্ধ করে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষে চলচ্চিত্র প্রযোজনা

ছবিটি মুক্তি পাবে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬, শুক্রবার। 'প্রিয়া' ছাড়াও আরো ১৪টি হলে।

ছবির পরিচালক রাজা সেন। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন--- **অর্জুন চক্রবর্তী। রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মল্লিক, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, জর্জ বেকার, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ ব্যানার্জী, ডাঃ বি. ডি. মুখার্জী, অনামিকা সাহা, পাপিয়া সেন, মিতা ব্যানার্জী, সোনালী চৌধুরী, মায়া ঘোষ** প্রমুখ। কণ্ঠসঙ্গীতে—হৈমন্তী শুক্লা ও অন্যান্যরা। ভাষ্যে—সব্যসাচী চক্রবর্তী।

ছবিতে দেখা যাবে একজন সাধারণ মানুষ নির্লিপ্তভাবে মানুষের সেবাকার্যে জীবনকে নিয়োজিত করে সেবাকেই তপস্যা ভেবে অনন্য সাধারণ মানবে পরিণত হওয়া। কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে কি কঠিন কঠোর সংগ্রাম করে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া। যৌবনে কঠিন তপস্যা-আরাধনা, বিশাল সন্ন্যাসী সংগঠন, বিপ্লবীদের জীবন গঠনে সাহায্য, আর্ত-পীড়িত-দুর্বল মানুষের সেবাতে আত্মত্যাগ, অস্পৃশ্যতাকে বিদূরিত করার জন্য তাঁর অনন্য সাধারণ প্রয়াস, তমসাচ্ছন্ন ধর্মীয় সন্ত্রাস ও সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার চেষ্টা, তাঁর এইসব কর্মপন্থায় একদিন তাঁকে মহাপুরুষে পরিণত করেছে, কি ভাবে?

কিভাবে তিনি অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ হলেন? অনাবিষ্কৃত নানা প্রামাণিক তথ্যতে ছবিটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পুরো ছবিতেই একটা নতুনত্ব রয়েছে। অবশ্যই দেখুন। **যোগাযোগ : ৯২৩১৮৭৮১১১।**

মালদার হবিবপুরে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির

গত ২৮ আগস্ট মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের ভালুকবোনা গ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের উদ্যোগে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির হয়ে গেল। আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে পাঁচশোরও বেশি মানুষ নারী-পুরুষ, শিশু-সহ এই শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সুযোগ পেয়েছেন। অনেককে বিনামূল্যে ওষুধও বিতরণ করা হয়। এলাকার বনবাসীরাও প্রচুর সংখ্যায় উপকৃত হয়েছেন। মালদা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-সহ এনএমও এবং আরোগ্য ভারতীর মোট ১১ জন ডাক্তার এই মহতী কার্যক্রমে সেবা দিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস, এনএমও-র দক্ষিণবঙ্গ সভাপতি ডাঃ তীর্থঙ্কর দেব প্রমুখ। মালদা শহরের ও উক্ত ব্লকের কার্যকর্তারা অধিক উৎসাহে এই শিবিরটি সফল করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে ভালুকবোনা গ্রামে একল অভিযানের একটি বিদ্যালয়-সহ বড় প্রকল্প রয়েছে। শিবিরটি উক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়। পুরো কার্যক্রমটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বাস্থ্য উদয়'। উদ্যোক্তরা জানান এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির মালদা জেলার অন্যান্য গ্রামেও অনুষ্ঠিত করা হবে।

মেজর ধ্যানচাঁদ

বিভাস মজুমদার

২৯ আগস্ট রাষ্ট্রীয় খেল দিবস যার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সারা দেশজুড়ে পালন করা হয় তিনি হলেন হকির জাদুগর মেজর ধ্যানচাঁদ। যাঁকে ক্রিকেটের কিংবদন্তী স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান এবং বিশ্ব ফুটবলের রাজা পেলের সঙ্গে সমান আসনে বসানো যায়। এই মহান কিংবদন্তী হকি খেলোয়াড়ের পুরো নাম মেজর ধ্যানচাঁদ সোমেশ্বর সিং। ১৯০৫ সালে ২৯ আগস্ট প্রয়াগে রাজপুত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সাধারণ পরিবারে জন্ম নিলেও দেশভক্ত ধ্যানচাঁদ ১৬ বছর বয়সে ১৯২১ সালে ভারতীয় সেনা বিভাগে ভর্তি হন। এর আগে তিনি কখনও হকি খেলেননি। সেখানে সুবেদার তিওয়ারী একখানি হকিস্টিক ধ্যানচাঁদের হাতে দিয়ে বলেন 'এখন থেকে সেনার জন্য হকি খেলতে হবে'। সেই থেকে অভ্যাস শুরু। নিরন্তর অভ্যাসের ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হকি খেলোয়াড় তৈরি হয়ে যান। তাঁর ধৈর্য, সংযম, অনুশাসন, সর্বোপরি দেশভক্তির জন্য অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

১৯২২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সেনার হয়েই হকি খেলেন। ১৯২৬ সালে নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য বিবেচিত হন ভারতীয় হকি খেলোয়াড় হিসাবে। এই সফরে ২১টি ম্যাচ খেলেন যার মধ্যে ১৮টি ম্যাচ জেতেন। ১৯২টি গোল করেন। ১৯৩২ সালে শ্রীলঙ্কা সফরে দুটি ম্যাচ খেলে প্রতিপক্ষকে ২১-০ এবং ১০-০ গোলে হারান।

নিউজিল্যান্ড সফরের পরেই তিনি অলিম্পিক খেলার জন্য নির্বাচিত হন। ধ্যানচাঁদের অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যর জন্য ভারতীয় হকিদল তিনবার অলিম্পিকে স্বর্ণপদক পায়। ১৯২৮ সালে আমস্টারডাম। ১৯৩২ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ১৯৩৬ সালে বার্লিনে। ভারতীয় হকিদলের সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক এদেশের খেলাধুলার জগতে অক্ষয় কীর্তি, যার নেপথ্যে মেজর ধ্যানচাঁদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ক্রিকেটের ডন ব্র্যাডমানের মতো মেজর ধ্যানচাঁদেরও চরম ক্ষতি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ অলিম্পিকের আসর বসেনি। তা না হলে ভারত পাঁচবারই অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেত। ১৯৪৮ সালে অলিম্পিক শুরু হলে ওই সময় তিনি অবসর নিয়ে নেন।

১৯২৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে সহস্রাধিক গোল করেন ধ্যানচাঁদ। ফুটবলে পেলের রেকর্ড মনে রাখলেও হকিতে মেজর ধ্যানচাঁদের ক্ষেত্রে আমরা তা ভুলে গেছি বা মনে রাখতে চাইনি।

১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে জার্মানকে ভারত ৭-১ গোলে হারায়। ধ্যানচাঁদের খেলা বিশেষত তাঁর স্টিকওয়ার্ক দেখে অ্যাডলফ হিটলার ধ্যানচাঁদকে জার্মানির নাগরিকত্ব দিতে চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে জামার্নির সেনা বাহিনীর সর্বোচ্চপদ কর্নেল র‍্যাঙ্ক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশভক্ত ধ্যানচাঁদ তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন আমি ভারতীয় ফৌজেই থাকতে চাই।

একবার ধ্যানচাঁদের একটি শট বারে লেগে ফিরে আসে। তিনি আম্পায়ারকে অভিযোগ করেন বার ছোট। বাস্তবিক মেপে দেখা যায় কয়েক মিলিমিটার বার ছোট। তাঁর অসাধারণ স্টিক ওয়ার্ক দেখে জনৈক ব্যক্তি সন্দেহ করেন যে তাঁর স্টিকে চুম্বক লাগানো আছে, স্টিক ভেঙে তার সন্দেহ দূর হয়।

বার্লিন অলিম্পিকের আগে জানকীকে বিবাহ করেন ধ্যানচাঁদ। তাঁর ৬ জন সুপুত্র ছিলেন ব্রজমোহন, সোহন সিংহ, রাজকুমার, অশোককুমার, উমেশকুমার এবং বীরেন্দ্র সিংহ। এদের মধ্যে অশোককুমার অলিম্পিকে হকি খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯৪০-১৯৪৭ মেজর ধ্যানচাঁদ পাকিস্তানে ফিরোজপুরে কতর্ব্যরত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে ভারতে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর সহযোদ্ধারা যুদ্ধে মারা যান। তিনি আক্ষেপ করে বলেন ওই যুদ্ধে আমি মারা গেলে সেটাই আমার সর্বোচ্চ সম্মান হোত। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে মেজর ধ্যানচাঁদকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করেন। ওই অনুষ্ঠানে জওহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন। মেজর ধ্যানচাঁদের ব্লেজারে অনেক ব্যাচ ঝোলানো ছিল। পণ্ডিত নেহরু ওই ব্যাচগুলির মধ্যে একটি ব্যাচ চাইলে মেজর ধ্যানচাঁদ বলেন, আমার অনেক ব্যাচ থাকলেও আপনার কোটে ওই গোলাপ ফুলই সুন্দর দেখায়, ওই গোলাপ দিয়েই সারা বিশ্ব আপনাকে চেনে।

১৯৭৩ সালে ধ্যানচাঁদ অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এমতাবস্থায় হকি ম্যাচ থাকলে তিনি হাসপাতাল থেকে মাঠে চলে আসতেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ার জন্য ম্যাচ-আধিকারিক বিশ্রাম নিতে বললে তিনি বলেন, "আমি দেখতে পাই না ঠিক কথা, কিন্তু মাঠের দর্শকদের আওয়াজ শুনে আমি অনুভব করি বল কোন দিকে যাচ্ছে, কত গতিতে যাচ্ছে।" শেষ জীবনে মেজর ধ্যানচাঁদের অনেক আর্থিক অনটনের মধ্যে কেটেছিল। উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেননি। ১৯৭৯ সালে ৩ ডিসেম্বর দিল্লীর এইমস হাসপাতালে সাধারণ বেডে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মতো দেশভক্ত বিশ্বখ্যাত হকি খেলোয়াড়কে যথাযোগ্য সম্মান আজও আমরা দিতে পারিনি।

শব্দরূপ-৮০৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

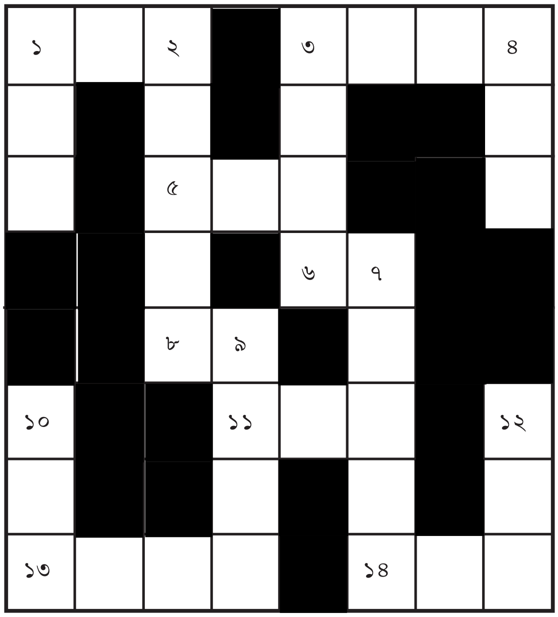

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. মনুষ্যবাহিত যান বিশেষ, দোলা **৩.** ওড়িশার নীলগিরি পর্বতমালা; জগন্নাথক্ষেত্র, **৫.** বেদনাজাতীয় ফল, ডালিম, **৬.** সূর্য, **৮.** খেলার বস্তুতে শক্তি, **১১.** 'মা আমায় ঘোরাবি কত, কলুর'—এর মত, **১৩.** অতি ক্ষুদ্র কিন্তু খুব ঝাল লঙ্কা, **১৪.** চতুর্থ পাণ্ডব; বেজি।

উপর-নীচ : ১. মুসলমান বিবাহবিচ্ছেদ, **২.** ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব সভা নির্মাণকারী দানব-শিল্পী; রাবণের শ্বশুর, **৩.** বলদেবের একটি নাম, **৪.** দুর্যোধনের কন্যা, কৃষ্ণের পুত্র শাম্বের পত্নী, **৭.** যে ঝগড়া করছে, **৯.** বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন, ফাঁকি, **১০.** পৃথিবী, **১২.** দই পাততে এটি লাগে।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০০
সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
গোপাল সিংহ
মানিকো,
দ: দিনাজপুর

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৮০৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

অর্থের অভাবই নয় অর্থের আধিক্যও ধর্মকে বিনাশ করে। এটা ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। পশ্চিমের লোকেরা অর্থের প্রভাবকে বিচার করে না। অর্থ যখন নিজের মধ্যে বা তার দ্বারা প্রাপ্ত পদার্থের মধ্যে ও প্রাপ্ত ভোগবিলাসের (আসক্তি) সঙ্গী হয়ে যায়, তখন অর্থের প্রভাব দেখা যায়। যেখানে কেবল পয়সা নিয়েই ব্যস্ত থাকে সেখানে দেশ, ধর্ম, জীবন সব কিছু ভুলে যায়। এইরকম বিষয়াসক্ত মানুষ পৌরুষহীন হয়ে নিজের ও সমাজের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রকার প্রভাবে অর্থ সাধন না হয়ে সাধ্যে পরিণত হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ ধর্মাচরণের সাধন না হয়ে বিষয় ভোগীদের সাধনে পরিণত হয়। বিষয় তৃষ্ণার কোনো সীমা না থাকার কারণে একদিকে কিছু ব্যক্তির সামনে সর্বদা অর্থের অভাব থাকবে। অপরদিকে পৌরুষহানির কারণে অর্থ উপার্জন করার ক্ষমতা কমতে থাকবে।

* * *

আজকাল ধ্বনি উঠছে— উপার্জনশীলরাই ভোগ করবে। সাধারণত এই ধ্বনি কমিউনিস্ট লোকেরা উচ্চারণ করে থাকে, কিন্তু পুঁজিবাদীরাও এই ধ্বনির মূলে নিহিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে অসহমত নয়, যদি দুইয়ের মধ্যে বিবাদ হয়— কে কতটা উপার্জন করছে? পুঁজিবাদী সাহস ও পুঁজিকে গুরুত্ব দেয় এবং সেইজন্য উপভোগকেই তারা প্রাধান্য দেয় এবং উচিত মনে করে। অপর পক্ষে কমিউনিস্টরা শ্রমকে নির্মাণ মনে করে। তাই তারা শ্রমিককে উপভোগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়। এই দুই প্রকার চিন্তাই ঠিক নয়। বাস্তবে আমাদের ধ্বনি হওয়া উচিত— 'উপার্জনশীল খাওয়াবে' এবং 'জন্মসূত্রে খাবে', খাওয়ার অধিকার জন্মসূত্রে আসে। উপার্জনের যোগ্যতা শিক্ষা থেকে আসে। সমাজে যে উপার্জন করেনি সেও খায়, ভোগ করে। শিশু, বৃদ্ধ, রুগী, অপারক— সবারই চিন্তা সমাজকে করতে হয়। প্রত্যেক সমাজ এই কর্তব্য নির্বাহ করে থাকে। মনুষ্য সমাজ ও সংস্কৃতির মাপকাঠি— এই কর্তব্য থেকেই উঠে আসে। এই কর্তব্য নির্বাহের ক্ষমতা নির্মাণ করাই অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য ও কাজ।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ৬

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৩

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - **সমুদ্ভাবিত অনুত্তম**
সুমিত্রা ঘোষ - **শিরিণ**
জিষ্ণু বসু - **আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি**

গল্প

রমানাথ রায় - **ভালোবাসার রকমফের**
শেখর বসু - **অন্তরালে**
এষা দে - **একতলার বাসিন্দা**
প্রবাল চক্রবর্তী - **দানবোত্থা ভবিষ্যতি**
গোপাল চক্রবর্তী - **দেশান্তর**

রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক - **চীনের চাউমিন আমাদের চাউমিন**

ভ্রমণ কথা

কুণাল চট্টোপাধ্যায় — **চীন থেকে ফিরে**

ইতিহাস

সৌমেন নিয়োগী - **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য— তালকাড**

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় - **বিশ্বশ্রীর মন্দিরে বেহাল দশা**

প্রবন্ধ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস - **মীরা পঞ্চশতী**
ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী - **শকাব্দ : ভারতের নিজস্ব জাতীয় কালপঞ্জী**
ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় - **ভগিনী নিবেদিতা ও সরলাদেবী চৌধুরানি**
ড. তুষারকন্তি ঘোষ - **উত্তরবঙ্গের ভারতভুক্তি আন্দোলনের এক বিস্ময়কর কাহিনি**
দেবীপ্রসাদ রায় - **আইনস্টাইনের ঈশ্বর ও ধর্মভাবনা এবং বেদান্ত**
অমলেশ মিশ্র - **বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর**
রবিরঞ্জন সেন - **মহারাষ্ট্রের ভক্ত-কবি পরম্পরা ও মারাঠা জাতীয় জাগরণ**
রজত পাল - **ঋকবেদ ও জেন্দ আবেস্তা**
অরিন্দম মুখোপাধ্যায় - **ছিন্ন তমসুকের কাহিনি**
অর্ণব নাগ - **রঘু ডাকাত : রূপকথায় ও বাস্তবে**
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় - **অবিস্মরণীয় কমেডিয়ানরা**

নবাঙ্কুর (ছোটদের বিভাগ)

সিদ্ধার্থ সিংহ - **অমরত্ব**
বিরাজ নারায়ণ রায় - **মহাদেবের ষাঁড়**
শান্তনু গুড়িয়া - **শব্দরূপ**

সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
5 September - 2016 - Rs. 10.00,

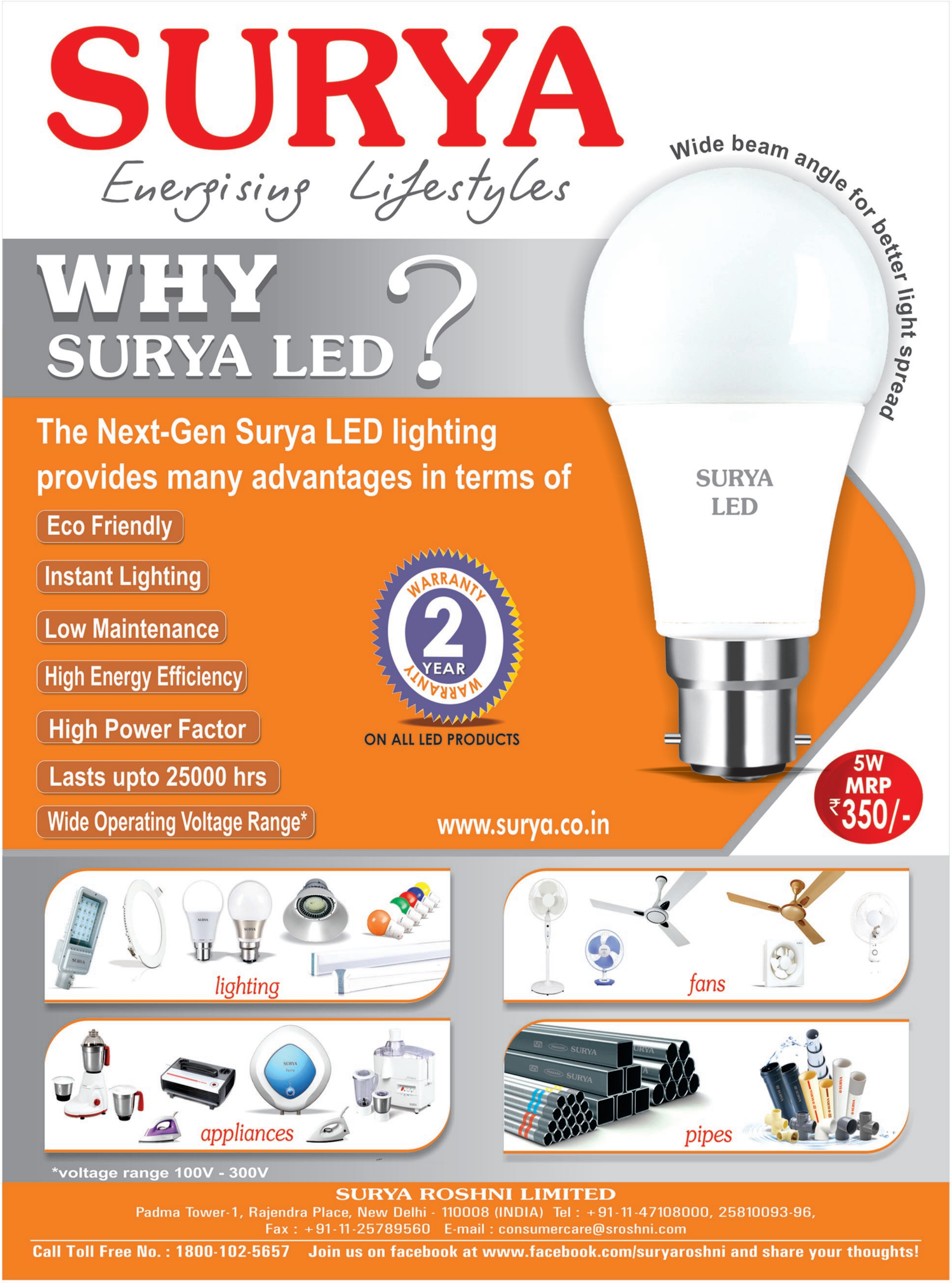

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।